ডরিয়লি

গীতালি বরা

মূল অসমিয়া থেকে বাংলা অনুবাদ বাসুদেব দাস

শরীর থেকে খসে পড়া আমার ছায়া
কখনও আর
ফিরে আসে না
শেওলা পরা একটা পাথরে
বসার জন্য
আঁকা-বাঁকা পথে
কোথাও চলে যাবার জন্য
আমার সঙ্গে একান্তে কান্নার জন্য
উৎ সাহের আনন্দে কাঁপার জন্য
কখনও আর ফিরে আসে না আমার ছায়া
এক টুকরো প্রাচীন পাথরে
তরোয়ালের চেয়ে তীক্ষ্ণ
একটা স্বপ্নের ধারালতায়
আমি আমাকে দূরছাই করেছিলাম
একদিকে আমি
অন্যদিকে আমার ছায়া
এখন যখন
নদীর বন্যার মতো
অপার কারুণ্যে ভেসে যাই
মাছ খুঁটতে থাকা
ধ্রুবতারার প্রতিবিম্বের মতো
একটা সত্য দেখতে পাই
---এই যে
ছায়ার জন্য চোখের জল ফেলছেন
আর আপনাকে শোনাচ্ছে বিষাদ মালিতা
সেটা আসলে আমার ছায়া
আর যা অকাতরে হারিয়ে গেল
সেটা আমি

(১)

ভোর হয়েছে। বন্দুকের শব্দে নয়। এক ঝাঁক পাখির কিচিরমিচির আর কোলাহলে। সকালের স্নিগ্ধ আলো দিহাঙের চোখে হালকা স্পর্শ বুলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দিহাঙ ওঠে বসল। মুখ হাত ধুয়ে সে যখন বাইরে এসে দাঁড়াল ,তখন পূব আকাশ লাল হতে শুরু করেছে। গতরাতে বৃষ্টি হয়েছিল। অরণ্যের সবখানে এখন একটা নতুন চমক। সদ্যস্নাতা কিশোরীর মতো কোমল আর পবিত্র ভাব। এই শিবিরটা মানসের উত্তর দিকে।বরপেটা জেলার সীমায়। পেছনে ভূটানের সারি সারি পাহাড়। বহু চিন্তা ভাবনার পরে সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতারা এখানে শিবির স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নিরাপত্তার দিক থেকে দেখতে গেলে এই জায়গা শিবির স্থাপনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ভূটানের শেষ গ্রাম আর অসমের সীমান্তে অবস্থিত লোকালয় থেকে জায়গাটার দূরত্ব প্রায় সমান। দ্রুত হাঁটলেও প্রায় পাঁচ

ঘন্টা লাগে। যদিও পশ্চিম মণ্ডলের মুখ্য শিবির হিসেবে নংলাম শিবির স্বীকৃত হয়েছে,সংগঠনের সমস্ত কাজকর্ম পরিচালিত হয় এই শিবির থেকে।

সবুজ পাতায় ছাওয়া চালা আর বাঁশ বেতের বেড়া দিয়ে তৈরি গোয়াল ঘরের মতো ছোট ছোট বেশ কিছু ঘর বাড়ি রয়েছে পাহাড়টাকে ঘিরে। কে যেন হুইসেল বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে ঘর গুলি থেকে দেড় ডজনের মতো ছেলে বেড়িয়ে এল। পাখির কাকলি,বাতাসের গোঁ গোঁ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের প্যারেডের শব্দ মিশ্রিত হয়ে বিচিত্র সুরের সৃষ্টি করল। দিহাঙ দেখল গোভা নামে নতুন সৈনিকটি প্যারেডের মধ্যে মধ্যে চোখ বুজছে। হয়তো ঘুমের রেশটা এখনও ভালোভাবে ভাঙ্গে নি। প্রশিক্ষক জংকি গোভাকে একটা চড় কষিয়ে দিল। তারপর তার দিকে একটা জলের বোতল এগিয়ে দিল। মুখে চোখে জল ছিটানোর পরে গোভাকে সতেজ দেখাল। চোখ দুটো ভালোভাবে মেলে সে প্যারেডে যোগ দিল।

সংগঠনে যোগ দেবার সময়ই সবাইকে শিখিয়ে দেওয়া হয় যে আলস্য আর জড়তাকে জয় না করতে পারলে কোনো ছেলেই মুক্তি সংগ্রামের আদর্শ সৈনিক হয়ে উঠতে পারে না। ঠাণ্ডা-গরম,অনাহার-অনিদ্রার সঙ্গে অভ্যস্থ হতে না পারলে তারা অনিশ্চত পথে যাত্রা করবে কীভাবে। স্বদেশ আর স্বজাতির মুক্তির স্বপ্ন দেখা ছেলেগুলি শীঘ্রই কঠোর সংগ্রামের কঠোর দিনলিপিতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। পেটে ক্ষুধা নিয়েও তারা হাসতে শিখে। ভুলের জন্য মধ্যবর্গীয় নেতাদের কাছ থেকে চড় চাপড় বেত খেয়েও হাসি তামাসা করে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বাঁচতে শিখে।

প্যারেডের শেষে ছেলেগুলি এদিক ওদিক চলে য়ায়। কেউ কেউ রান্নার কাজে মন দেয়,কেউ পাহাড়ের ঝরণায় স্নান করতে চলে যায়। দুপুরে পুনরায় পলিটিকেল ক্লাস শুরু হবে,বিকেলে প্রশিক্ষণ। দিহাঙ একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভোরের এই অনির্বচনীয় শোভা প্রতিদিন তার মনে আশা আর নিরাশার মিশ্রিতভাব জাগিয়ে তোলে।

তবু আজকের সকালটা একটু আলাদা। ক্যালেণ্ডারের বিবর্ণ হয়ে যাওয়া পাতা গুলি থেকে পাঁচ বছর আগের কিছু স্মৃতি যেন নতুন পোষাক পরে উঠে এল আর দিহাঙের দুচোখ নিজের অজান্তেই ভিজে উঠল। হঠাৎ কৃষ্ণচূড়ার একটা ডাল থেকে কে যেন হো হো করে হেসে উঠল আর দিহাঙের তন্ময়তা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল।

ওপর দিকে তাকিয়ে দিহাঙ নয়নকে দেখতে পেল --কৃষ্ণচূড়ার জোড়া ডাল একটায় সে আরাম করে বসেছিল।

--ওখানে কি করছিস ? চিৎ কার করে ডিহাঙ জিজ্ঞেস করল। 'এমনিতেই উঠেছিলাম' --বলতে বলতে নয়ন নেমে এল। ' তারপর দেখি আপনি কিছু একটা চিন্তা করছেন। আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম--কবিতা লিখবেন নাকি এখন। তার ঠোটের কোনে তখনও দুষ্টুমির হাসি লেগে রয়েছে।

' কবিতাকে কেউ ভয় করে নাকি ? নয়েনর দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে দিহাঙ ডিজ্ঞস করে। তারপর নেতার গাম্ভীর্য নিয়ে আদেশ করে --চল হাঁটি। নয়নের দিকে ফিরে না তাকিয়েই দিহাঙ হাঁটতে শুরু করেছিল। মুহূর্তের মধ্যে নয়নও লম্বা লম্বা পা ফেলে তার কাছাকাছি চলে আসে। চোখের আড়াল দিয়ে একবার দিহাঙকে দেখে নেয় নয়ন। যেন এক ঘোর-নেশার মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছে দিহাঙ। শিবিরের সবাই দিহাঙের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা জানে। খুশ মেজাজে থাকা ছেলেটি মাঝে মাঝে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যায়। সেই গাম্ভীর্য ইটের প্রাচীরের মতো,সহজে নড়ে না ভাঙে না।

অরণ্যের গভীরে সমতলে একটা জলাশয় রয়েছে। নিচের দিকের জায়গাটা ভয়াল। হরিণ,বন্য মোষ,বন্য গরু থেকে শুরু করে শিয়াল কুকুর পর্যন্ত বিভিন্ন জন্তু এখানে জল খেতে আসে। কখনও কখনও হাতির পালও চলে আসে। দিহাঙ সেদিকটাতেই হেঁটে চলে। মুখে কিছু না বলে নয়নও দিহাঙের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যায়। গাছের ডালে বসে নিবিষ্ট মনে সূর্য প্রণাম করতে থাকা মানুষের আদিপুরুষ কয়েকটি সেই সকালবেলাতেই মানুষের মুখ দেখে বিরক্ত হয়ে ওঠল। ধ্যানস্থ ঋষির ভঙ্গিমা ছেড়ে তারা মানুষদুটির দিকে উঁকি ঝুকি দিতে লাগল। দিহাঙ পকেট থেকে দুটো বিস্কুট বের করে তাদের দিকে এগিয়ে দিল। বীরদর্পে এগিয়ে এসে আদি পুরুষের জ্যেষ্ঠটি দিহাঙের কাছ থেকে বিস্কুটটি কেড়ে নিয়ে নিল--ভাবটা দেখে মনে হয় দিহাঙ যেন কোনো রাজাকে তার খাজনা দিচ্ছে।পরিস্থিতিটা হাস্যকর ছিল। ইস তার কায়দা দেখে মনে হচ্ছে যেন আমরা তার ধার খেয়েছি--নয়ন বলল। ধার তো খেয়েছিই। ওদেরই জঙ্গলে রয়েছি। ওদের ভাগের ফলমূল খাচ্ছি--ওদের শান্তি ভঙ্গ করছি। দিহাঙের কণ্ঠস্বর তখনও গম্ভীর।

মাঝে মাঝে দিহাঙের বাইরের খোলসটায় নয়নের টোকা দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত কথায় নাক গলানোকে সংগঠনে দুর্বলতা বলে গণ্য করা হয়। স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখা ছেলেগুলিকে প্রথমেই সংযম আর পরিশ্রমের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তাদের

অতীতের মোহ থেকে মুক্ত হতে বলা হয়েছিল। ব্যক্তিস্বার্থকে গুরুত্ব দিলে অগণন পরাধীন জনতার হয়ে কাজ করার দায়িত্ব তারা কীভবে পালন করবে। সংগ্রামের জন্য সমর্পিত তাদের এক একজনের অতীতহীন সত্বা ছিল--সংগ্রাম ছাড়া যার কোনো বর্তমান ছিল না--ভবিষ্যৎ বলতে যারা স্বাধীন অসমের একটা অস্পষ্ট স্বপ্ন দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু নয়ন জানে তারা কেউ অতীত থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

কাচিনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোদ্ধা নয়ন। ডেথ ভ্যালি নামে খ্যাত হুকং উপত্যকায় কঠোর প্রশিক্ষণসূচি সমাপ্ত করে এই শিবিরে এসেছে সে। এখানে এসে সে যখন জানতে পেরেছিল শিবির পরিচালনার দায়িত্ব দিহাঙ রাজগুরুর ওপর ন্যস্ত হয়েছে তখন নয়ন খুব আনন্দিত হয়েছিল। দিহাঙের কবিতা পড়েছে সে।

এই যে ঘর বাড়ি ছেড়ে ,উজ্জ্বল ক্যারিয়ারের মোহ ছেড়ে নয়ন সংগঠনে এসেছিল ,তার মূলে দিহাঙের কবিতার অনেকটা প্রেরণা রয়েছে। নয়ন জানে --ভূটানের সিএস কিউ থেকে দিহাঙকে জরুরি খবর পাঠিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে। আগে অনেকবার ভূটানে যাওয়া দিহাঙের কাছ থেকে তারা সি এস কিউর কথা গল্পের মতো আগ্রহ নিয়ে শোনে। সেই ছোট দেশটির ভূগোল আর সংস্কৃতি বিষয়ে দিহাঙের জ্ঞান অপরিসীম। আসলে অনেক বিষযেই দিহাঙের অগাধ জ্ঞান রয়েছে। অরণ্যের এই শিবিরে বসবাস করা ছেলেদের দিহাঙ শেখায় কীভাবে অরণ্যে অরণ্যের সন্তান হয়ে বসবাস করা যায়। পশু পক্ষীর কলরব শুনে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ জানা,বিপদের আগাম সংকেত লাভ করা ,সবুজ লতা পাতা আর বাঁশ বেতের দ্বারা নানা ধরনের প্রয়োজনীয় ছোটখাট জিনিস তৈরি করা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই দিহাঙ তাদের শিখিয়েছে। তাছাড়া দিহাঙ সব সময় লক্ষ্য রাখে সংগঠনের নীতি আর আদর্শের প্রতি ছেলেদের যাতে একটা স্পষ্ট ধারনা আর আনুগত্য থাকে।

আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সোনালি রোদ রাতের ভিজে অরণ্যেক কিছু সময়ের মধ্যেই ঝলমলে করে তুলল। তারা বিলের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিল। নয়ন অবাক হয়ে চারপাশে তাকাল--বসন্ত যেন নিজের সমস্ত রঙচারপাশে আবিরের মতো ছড়িয়ে দিয়েছে। সোনারু,রাধাচূড়া,কৃষ্ণচূড়া,গুলঞ্চ আর কিছু এজার --লাল,সাদা,হলদে ,গোলাপি এবং বেগুনি রঙ জলাশয়ের চারপাশটাকে ঘিরে রেখেছে। সেই সৌন্দর্যে বুকটা যেন কেমন করে ওঠে।

ইউনিফর্ম জোড়া খুলে ঝোপের পাশে রেখে দিহাঙ জলে নেমে গেল। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করে এক ঝাঁক ডাহুক তীরের দিকে উড়ে গেল। রোদের সোনালি আভা যেন বিলের জনে আর অরণ্যের সবুজে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। নয়ন দেখল চিল সাঁতার দিয়ে দিহাঙ বিলের মাঝবরাবর পৌছে গেছে। স্যার আমিও আসছি --পাশের ঝোপে কাপড় চোপড় খুলে রেখে জাঙ্গিয়া পড়েই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল নয়ন। ফিরে আসার সময় দিহাঙের গম্ভীর মুখে খুশির আভা ফুটে ওঠেছিল। সে নিজেই এবার কথা বলতে শুরু করল। ভূটানে থাকার জন্য ঝঙ্খা ভাষাটা শেখা অত্যন্ত আবশ্যক। ঝংখা বৌদ্ধ ধর্মীয় মঠের ভাষা। ভূটানের ভাষা সংস্কৃতি সমস্ত কিছুই বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়। বৌদ্ধ মঠের সংস্কৃতিই ভূটানিদেরও সংস্কৃতি। .....এবারের সি এস কিউ এর উচ্চ পর্যায়ের মিটিঙে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিছুটা পরিবর্তনও হবে।

স্যার ,আমাকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবেন কি ? প্রয়োজনে আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি জে এস কিউ তে থাকব--নয়ন অনুনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞস করে।

ভেবে দেখি দাঁড়া। তাছাড়া য়াবার দিন এখনও ঠিক করা হয় নি। এক দেড় মাস লেগে যাবে বোধ হয়। এখানকার সমস্ত খবর,নথিপত্র জোগাড় করে তৈরি হতে হবে--দিহাঙ বলল।

সূর্যটা যেন লাফিয়ে ওঠে এল। ঝিরঝির করে কাঁপতে থাকা গাছের পাতাগুলি থেকে মাঝে মধ্যে টুপটুপ করে ঝরে পড়ছে রাতের শিশির। নয়নের মুখ থেকেও কাঁপা কাঁপা স্বরে বেরিয়ে এল একটা প্রশ্ন --সকালবেলাতেই স্যার এত গম্ভীর হয়েছিল কেন ? ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। দিহাঙ চট করে থেমে গেল। কঠোর দৃষ্টিতে নয়নের দিকে তাকাল। কিন্তু এখনও কৈশোরের সরলতা ম্লান না হয়ে যাওয়া নয়নের কোমল মুখটি দিহাঙের চোখদুটিকে কোমল করে আনে। বুকের ভেতর এক অজানা কষ্ট গুমড়ে ওঠে। যেন অপরিচিত পথে একা চলার সময় বুকের গভীরে দাগ কেটে বসা চিং কার।

জাহ্নবীর কথা ভাবছিলাম--মাত্র কিছুক্ষণের জন্য।....নিজ হাতে ভেঙ্গে ফেলা স্বপ্নের টুকরোও কখনও ভাঙ্গা কাঁচের মতো মনে পড়ে---

পলিটিকেল ক্লাসটা শেষ করে শিবিরের সামনের খালি জায়গাটিতে প্লাষ্টিক পেতে বসল দিহাঙ। তার মুখে চিন্তার রেখা। অর্জুন নামে

শিবিরে নতুন আসা ছেলেটির শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। হয়তো অরণ্যের এই পরিবেশের সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। কিন্তু অর্জুনের যখন কাঁপতে কাঁপতে জ্বর এল এবং শিবিরে থাকা ঔষধ এবং ইঞ্জেকশন দিয়ে কোনো কাজ হল না তখন দিহাঙরা বেশ বেকায়দায় পড়ে গেল। অর্জুনের কাচিনে প্রশিক্ষণ নিতে যাবার কথা ছিল। কম সময়ের মধ্যেই সে নিজের স্বভাবগুনে সবারই প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিল। শিবির থেকে নেমে এলে অসমের প্রথম গ্রাম বরপথার। সেখানে যদিও একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে ,তবে অর্জুনকে এই অবস্থায় সেখানে নিয়ে যাওয়াটাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। নিরাপত্তার দিকে থেকেও কথাটা ভেবে দেখতে হবে। গতকাল রাতেই দিহাঙ ভূটান থেকে একজন ডাক্তার নিয়ে আসার জন্য একটা ছেলেকে পাঠিয়েছিল। ওরা এখনও ফিরে আসে নি। এদিকে অর্জুন ভুল বকতে শুরু করেছে। যে দুটো শব্দ তারা বুঝতে পারছে তা হল মা আর পাপড়ি। পাশের নদীতে বোমা ফাটিয়ে গোভারা বেশ কিছু মাছ ধরে এনেছিল। কেউ একজন দিহাঙের কাছে অ্যালুমিনিয়ামের একটা থালায় কয়েকটি পোড়া মাছ,নূন আর অল্প ঠাণ্ডা ভাত রেখে যায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দিহাঙ খেতে শুরু করে। বাড়া ভাত না খেলে পরে কতদিন উপোসে থাকতে হবে তা কে বলতে পারে।

বিকেলের দিকে অর্জুনের জ্বরটা একটু কমে এল। কিন্তু শরীরের প্রচণ্ড ব্যথায় ছেলেটি কাতড়াতে লাগল। নয়নদের অর্জুনের কাছে রেখে পাহাড়ি জংলী পথ দিয়ে দিহাঙ ওপরে ওঠতে লাগল। কিন্তু কিছুদূর যাবার পরেই আকাশ মেঘলা হয়ে ওঠল। যেন একটা কালো দৈত্য। ঝিরঝির করে বওয়া বাতাস সোঁ সোঁ করে শব্দ তুলে গাছপালাকে যেন মাটিতে মিশিয়ে দিতে চাইল। বিকেল হতে হতে চারপাশ অন্ধকার হয়ে এল। আকাশে বিদ্যুতের আঁকা বাঁকা রেখা দেখা গেল-যেন আগুন জ্বলছে। তারপরেই গুম গুম গর্জনের শব্দ।

খুব কম সময়ের মধ্যেই ঝড় তীব্রতা লাভ করল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দিহাঙ আর এগিয়ে না গিয়ে শিবিরে ফিরে যাবার কথা ভাবল। গাছ ভেঙ্গে কখন যে কার ওপর পড়বে তার কোনো ঠিক নেই। ফিরে যেতে উদ্যত হতেই কে যেন পেছন থেকে ডেকে ওঠল স্যার,স্যার। একটা জলরঙ্গের ছবির মতোই সামনের অরণ্যের রঙ বৃষ্টিতে ছড়িয়ে পড়ছিল। তবু--সেই ধূসরতার মধ্যেও দিহাঙ দেখতে পেল তিনজন মানুষ দ্রুতবেগে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। কাছে গিয়ে দিহাঙ আশ্বস্ত হল--রাজেন আর প্রাণেশ্বর। সঙ্গের বেঁটে খাট শক্ত সমর্থ ভুটিয়া লোকটির সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিল।

রাজেন বলল এই বেজ (চিকৎ সক) লালং বস্তির। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করে নিয়ে এসেছি। বেজ সরল হাসি হাসলেন।দিহাঙভূটানের মানুষের অদ্ভুত ধরনের প্রাকৃতিক চিকিৎ সার কথা জানত। বৃষ্টিতে ভেজামানুষটির শরীরের উৎ কট গন্ধ বিরক্তির সৃষ্টি করলেও দিহাঙ তাকে জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই প্রত্যেকেই দ্রুত শিবিরের দিকে এগিয়ে চলল। সিএস কিউ তে থাকার সময়েই ছালুং চিকিৎ সা পদ্ধতি বিষয়ে দিহাঙ জানতে পেরেছিল। ভুটিয়া চিকিৎ সকটি এখন সেই পদ্ধতিতেই চিকিৎ সা শুরু করলেন। অর্জুনকে এক টুকরে বড় প্লাস্টিকের ওপর উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হল। তারপর শরীরের যে অঙ্গ গুলিতে ব্যথা তার আকৃতি আর বেদনার অনুভূতি মগজে কেন্দ্রীভূত করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তারপর মুখ বন্ধ করে নাক দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে তা শরীরের বিভিন্ন শিরা উপশিরা দিয়ে প্রবাহিত করে দিতে বলেলন। বেজের নির্দেশানুসারে প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় এরকম করার পর অর্জুন আরাম বোধ করতে লাগল এবং ওঠে বসে এক গ্লাস জল খেতে চাইল। ভুটিয়া বেজ ভাঙা ভাঙা অসমিয়া বলতে পারেন। শিবিরের ছেলেরা তার অসমিয়া শুনে বেশ মজা পেল। দিহাঙ ঝাঙ্খা ভাষা কিছুটা জানত। বেজ তা জানতে পেরে বেশ অবাক হল। অর্জুন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে না উঠা পর্যন্ত বেজ শিবিরেই থাকবেনএই রকম একটি বন্দোবস্থ করা হল। বিনিময়ে কিছু টাকার সঙ্গে তাকে তেল,সাবান,আর গান শোনার একটা যন্ত্র দিতে হবে। তাঁর দাবির কথা শুনে শিবিরের ছেলেদের মুখ টিপে হাসতে দেখে দিহাঙ তাদের বোঝাল যে ভূটানের সাধারণ মানু আজও তেল সাবান ব্যবহারের সুযোগ পায় না।

দেওথাঙের ট্রানজিট ক্যামপ আর ভূটানের অন্যান্য ক্যামপে সংগঠনের ছেলেরা তেল,সাবান স্থানীয় লোকদের মধ্যে বিতরণ করে। ওগুলি তাদের কাছে অমূল্য সমপদ। এধরেনর মূল্যবান সামগ্রী উপহার দেওয়া শিবিরের ছেলেদের ভূটানিরা সহজেই নিজেদের আপনজন বলে মেনে নেয়।

রিন পচ্ছে (ঈশ্বরের দূত,অলৌকিক গুণসমপন্ন পুরুষ) একজন শিবিরে রয়েছে --এই কথাই ছেলেদের মনে আনন্দের সৃষ্টি করল। অর্জুনের অসুস্থতার জন্য সবাই ভুলে যাওয়া কথাটা এক বিকেলে গোভা আবার মনে করিয়ে দিল। 'আগামীকাল স্যারের পশু শিকারের কথা ছিল। ' কথাটা দিহাঙও ভুলে গিয়েছিল। এখন মনে পড়ে যাওয়ায় সে না শোনার ভান করে রইল। কিন্তু,রাজন,জঙ্কি,গোভা ,মৃদুল প্রত্যেকেই দিহাঙকে চারপাশ থেকে ঘিরে দাঁড়াল।

' স্যার,আপনি কথা দিয়েছিলেন। '--জঙ্কি বলল। হ্যাঁ,দিহাঙ কথা দিয়েছিল। বন্দুক চালানোয় দিহাঙের নিশানা একেবারে অব্যর্থ। যে

কোনো জড় বস্তু লক্ষ্য ভেদ করার ব্যাপারে একমাত্র একলব্যের সঙ্গেই দিহাঙের তুলনা করা যেতে পারে--একথাটা মিথের মতোই সবার মুখে ঘুরে বেড়ায়। অন্ধকারেও দিহাঙ কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। কিন্তু দিহাঙ কখনও বিনা কারণে একটা সজারু ও হত্যা করে নি। এই কথাটা নিয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবরা প্রায়ই হাসি ঠাট্টা করে। একসপ্তাহ আগেও এরকমই একটা নির্দোষ তামাসা চলছিল শিবিরে। কে জানি একজন একটু দূরে গিয়ে বলে বসল --' কবিতা লেখা মানুষ বন্দুক দিয়ে বেলুন ফাটানো ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না।' ব্যস । দিহাঙের আত্মসম্মানে লেগে গেল। 'আমি তোদের পশু শিকার করে দেখিয়ে দেব। ' মনে মনে আহত হলেও দিহাঙ খুব স্বাভাবিকভাবেই বলেছিল।

' কবে ? কবে ? তার উপরে য়েন গোটা শিবিরটা ঝাঁপিয়ে পড়ল।

' সোমবার ' জবাবে দিহাঙ বলেছিল। আগামীকাল সেই সোমবার। দিহাঙের চারপাশে তার সতীর্থদের মুখ গুলি উৎ সাহে জ্বলজ্বল করছে। যেন দিহাঙের শিকার একটা জনপ্রিয় সিনেমার শুটিঙ মাত্র।

' স্যার,আপনি কথা দিয়েছিলেন । এখন আর পিছিয়ে গেলে চলবে না--রাজেন বলল। দিহাঙ ওঠে দাঁড়াল। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে গভীরভাবে বলল --'দিহাঙ রাজগুরু কথা দিয়ে কখনও কথার খেলাপ করে না। '

'হুররে ...একটা আনন্দের ধ্বনি উঠল। 'আগামীকাল কখন স্যার ? হাসি স্ফুর্তির মধ্যেই কে য়েন একজন জিজ্ঞেস করল।

' বিকেলে। পলিটিকেল ক্লাসের পর। 'দিহাঙ জবাব দিতে দিতে তার ছোট ঘরটাতে ঢুকে গেল।

জঙ্গলের মধ্যে বিলের পাশটাতে মুক্তঘাসে হরিণ চড়ে বেড়ায়। বড় বড় চোখের হরিণ গুলির ঘাস খেতে থাকা দৃশ্য অনেকদিন ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনের আনন্দে দিহাঙ দেখেছে।সে এক অপূর্ব নান্দনিক দৃশ্য। দুই একবার জঙ্কিরা জঙ্গল থেকে ভোজ খাবার জন্য হরিণ শিকার করেছে। সেটা অবশ্য কোনো একটা উৎ সবের সময়। কখনও খাবারের অনটন দেখা দিলেও মানসের এই অংশে শিবিরের কোনো ছেলে পশু শিকার করেছে। অন্ততঃ শিবিরের সবাই সেদিন পেটভরে খাবার সুযোগ পায়।

আজও ছেলেরা অরণ্যের পাশের একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল। দিহাঙের সঙ্গে জঙ্কি ,রাজেন,নয়ন,মাইহাং এবং মৃদুলও এসেছে। মহাশয শিকার করার এই ঘটনা নিশ্চয় ইতিহাসের পাতায় সন্নিবিষ্ট হবে। ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক ঘটনারূপে স্বীকৃতি লাভ করতে চলার ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার সুযোগ লাভ করাটা কম কথা নয়।

বিকেলের ঝিরঝির বাতাস অরণ্যের বুকে এক নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করছিল। চারপাশে অরণ্যের চিরন্তন অপাপ শব্দরাজি। দিহাঙের মনের চোখে অন্য একটি ছবি আসা যাওয়া করতে থাকল। একটি হেলানো পাইনের অরণ্য--পাতলা সাদা চাদরের মতো কুয়াশা আর আঁকা বাঁকা একটা পাকা রাস্তা। শিলঙের পাশের আপার লুমপারিঙের ছবি ওটা। সেই অরণ্যের পাশে জীবনের সমস্ত জমানো পুঁজি নিয়ে দিহাঙের মা একটা নতুন দোতালা বাড়ি কিনেছিল। মা ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। শিলঙে পোস্টিং ছিল। সেই তখনকার দিনেই জারজ সন্তানকে জন্ম দেবার মতো সাহস দেখিয়েছিলেন তিনি। সংগঠনে যোগ দিয়ে ব্রহ্মদেশে চলে যাবার আগে মায়ের সঙ্গে কয়েকরাত এই বাড়িটিতে কাটিয়েছিল দিহাঙ। নির্জনতা প্রিয় মানুষটার সেই তো একমাত্র বন্ধু ছিল। মায়ের হাতের তালুতেনিজের খালি হাতের মুঠি খুলে কিছু একটা দেবার ভঙ্গি করত দিহাঙ। 'এই পাইনের অরণ্যটা তোমাকে দিলাম--কত নির্জন আর সুন্দর দেখেছ। হেসে হেসে মায়ের কানে গুণগুণ করে বলেছিল কবিতা লেখা ছেলেটি। সেদিন রাতে নিষ্কলুষ জ্যোৎ স্নার আলোতেআকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। নির্মল রূপালি তারা খচিত লুমপারিঙের আকাশ। পাহাড়ের চূড়ায় একটা পাকা বেলের মতো চাঁদটা ঝুলে ছিল। বেলকনিতে বসে মা-ছেলে কথা বলছিল।'ঐ চাঁদটা তোমার--দূরে আঙ্গুল তুলে দিহাঙের মা বলেছিল। তার চোখে যেন জ্যোৎ স্নার স্নিগ্ধ রূপালি রঙ আলোড়নের ঢেউ তুলেছিল। হ্যাঁ,ওটা একান্তভাবেই তাদের মা-ছেলের খেলা ছিল। মা আর দিহাঙের। অনন্য-অমূল্য উপহারগুলি এভাবেই তারা পরস্পর পরস্পরকে অর্পণ করছিল। এভাবেই তারা মা আর ছেলে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুখি মানুষ হয়ে উঠছিল। পরস্পরের মধ্যেই সীমিত ছিল তাদের পৃথিবীটা--সেখানে আর কারও স্থান ছিল না। এক দল হরিণ লাফাতে লাফাতে কাছে চলে আসছিল। লাল নীল জাতিষ্কার হয়ে থাকা স্বপ্নিল অরণ্য আর তার মধ্যে কয়েকটি হরিণ।-অনেকদিন আগে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া রঙ তুলির বাক্সটার কথা দিহাঙের মনে পড়ে গিয়েছিল। 'স্যার আপনি পারবেন কি--রাজেন ফিসফিস করে জিজ্ঞস করল। অসুবিধে হলে না হয় আমিই--বলে সে ট্রিগারে হাত রাখে। দিহাঙ হাত তুলে রাজেনকে নিষেধ করে। চোখের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় যে সে পারবে। হঠাৎ নয়ন কিছুটা অস্থির অনুভব করে। সে ভালো করেই জানে দিহাঙ বন্য পশু পাখিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। গাছের ডালে কয়েকটা পাখি কোলাহল আরম্ভ করল। কাছেই কযেকটা বাঁদরও খেঁকিয়ে উঠল। হয়েতা তারা বন্দুকধারীর দলটাকে দেখে হরিণের দলটাকে

সতর্ক করতে চেয়েছিল। সত্যি সত্যিই সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে হরিণগুলি এদিক ওদিক তাকাতে পিছোতে লাগল। গুড়ুম গুড়ুম । গুলির শব্দ। হরিণগুলি এদিক ওদিক দিকভ্রান্তের মতো পালিয়ে গেল। আশেপাশের গাছ থেকে কয়েকটা পাখির ঝাঁক উড়ে পালাল। অরণ্যের শান্ত স্বর মুহূর্তের মধ্যে কোলাহলে পরিণত হল। প্রত্যেকেই দেখতে পেল একটা হরিণ শাবক চিৎ হয়ে ঘাসের উপর পড়ে রয়েছে। লাল রক্তে আশের পাশের ঘাস ভিজে গেছে। দ্রুত দৌড়ে দিহাঙ হরিণ শাবকটার কাছে পৌছাল। পেছন পেছন নয়নরা। সকলেই দেখতে পেল পেছনের পায়ের কিছুটা উপরে গুলি লেগেছে। আঘাত খুব বেশি গুরুতর নয়। দিহাঙ কোমর থেকে একটা ছুরি বের করে নিপুণ সার্জনের মতো গুলিটা কেটে বের করে। ক্রন্দনরত শাবকটা মেয়ে। কু কু করে কাঁদতে থাকা স্বরটা যেন কোনো মেয়ের বিনুনি। --'এ জায়গটা একটু টিপে ধরে রাখ। --দিহাঙ নয়নকে নির্দেশ দিল।

' স্যার কষ্ট পাওয়ার চেয়ে একেবারে --রাজেন কিছু একটা বলতে চাইল। 'চুপ'তার কথা দিহাঙ মাঝপথেই বন্ধ করে দিল। ঘাসের মধ্যে সে যেন কিছু একটা খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দিহাঙ লাল আর সবুজ দেখতে কিছু ঘাসপাতা নিয়ে ফিরে এল। পাতাগুলি পিষে হরিণের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে পুনরায় দিহাঙ যেন কিছু একটা খুঁজতে লাগল তারপর পরনের শার্টের একটা অংশ অবলীলাক্রমে ছিঁড়ে ফেলল। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শার্টের ছেঁড়া অংশটা দিয়ে হরিণ শিশুটার ক্ষতস্থানটাকে বেঁধে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিণ শিশুর গোঙ্গানিটা কমে এল। হয়তো গাছের লতাপাতা তার যন্ত্রণার কিছুটা উপশম ঘটিয়েছে.। তার গভীর বড় বড় দুটো চোখ মেলে উপস্থিত সবার দিকে তাকাল। ভয় আর বেদনায় ভরা চাহনি। দিহাঙ হাঁটু গেড়ে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এক ধনের আত্মসমর্পণের মতোই হরিণ শাবকটি চোখ বুজে নিল। 'এটাকে এভাবে এখানে রেখে যাওয়া চলবে না। স্বগতোক্তি করার মতো দিহাঙ বলল এবং হরিণ শাবকটাকে কোলে তুলে নিল। নয়ন ছাড়া দিহাঙের অন্যান্য সঙ্গীদের চোখ বিস্ময়ে কপালে উঠল। শিকার করতে এসে তাদের নেতা এসমস্ত কি শুরু করেছে। তাদের বিস্মিত চোখের দিকে তাকিয়ে দিহাঙ সোজাসুজি বলল --'জীব জন্তু শিকার করতে পারব না বলেছিলি ,শিকার করে দেখালাম। ভবিষ্যতে তোরা আর কখনও এরকম বলতে পারবি না। আরও একটা কথা --তোদের আমি হরিণের মাংস খাওয়াব বলিনি । এরকম কোনো আশা তোরা যেন কখনও পোষণ না করিস। অরণ্যের আঁকাবাঁকা পথ ধরে শিবিরের দিকে এগিয়ে চলল দিহাঙ রাজগুরু। কোলে একটা অবোধ আহত পশু।

হঠাৎ নয়নের মনটা আনন্দে ভরে গেল। সঙ্গের কয়েকজনকে সেখানেই রেখে ছোট একটা শিশুর মতো শিস বাজাতে বাজাতে এক দৌড়ে দিহাঙের কাছে এসে উপস্থিত হল। নয়নের হাসিতে ঝলমল চোখমুখের দিকে তাকিয়ে দিহাঙ চোখ লাল করে বলল --এত স্ফুর্তি করার মতো তোর আবার কী হল ? বোকার মতো মাথা চুলকাতে লাগল নয়ন। কিছু কিছু কথা মুখ ফুটে বলা যায় না। প্রকাশের ভাষা সে এমনিতেও দিহাঙের মতো জানে না। কিন্তু সে জানে দিহাঙ তার আনন্দের কারণটা ঠিক বুঝে নেবে। চুপ করে থেকে সে দিহাঙের কোলে চোখ বুজে পড়ে থাকা হরিণ শাবকটির মাথায় হাত বোলাতে লাগল। নয়ন বলল --এর একটা নাম দেওয়া যেতে পারে। দেব কি দিহাঙ মুখ টিপে হাসল। ' নাম অবশ্য একটা রাখা যায় । তবে কী নাম রাখবি ? এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে নয়ন বলে ওঠল --অসমী । কেমন হবে নামটা ? অসমী --অসমী খুব ভালো হবে। সূর্য দূরের একটা পাহাড়ে অস্ত যাচ্ছিল। দক্ষিণ আকাশে কালো দৈত্যের মতো ঘনিয়ে উঠছিল মেঘ। আর্দ্র বাতাসে বন্য ফুলের সুবাস ভেসে এসে তাদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছিল। শিবিরের কাছাকাছি পৌছে তারা দেখতে পেল ছেলে বাঁশের বেত দিয়ে কি যেন তৈরি করছে। তাদের মাঝখানে অর্জুনকে দেখে দিহাঙ বেশ অবাক হল।

'তুই উঠতে পেরেছিস ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া ছেলেটি লাজুক ভাবে হাসল। শরীর ভালো আছে তো । তার চোখ দিহাঙের কোলে। বাঁশের ধাড়ি একটায় ভূটানের বেজ বসে রয়েছে। ছেলেদের মতো তিনিও উঠে এসে দিহাঙের কাছে দাঁড়ালেন। দিহাঙ অসমীকে কোল থেকে নামাল। -বিন পচ্ছে ,এর নাম অসমী। আমাদের অতিথি। আপনাকে একেও সুস্থ করে তুলতে হবে। নয়ন সতীর্থদের শিকারের কাহিনিটা বলতে শুরু করল।

(৩)

.....মাও সে তুঙ বলেছিলেন --বিপ্লবীদের পিয়ানো বাজানো শিখতে হবে। পিয়ানো বাজানোর জন্য হাতের সবগুলি আঙুল ঠিকভাবে এবং সমানভাবে সঞ্চালন করতে হয়। এই কাজটা যে ভালোভাবে করতে পারে তার পক্ষেই পিয়ানোতে মনোমুগ্ধর সুর সৃষ্টি করা সম্ভব। একইভাবে একজন বিপ্লবী কেবল ভালোভাবে বন্দুক চালাতে জানলেই হবে না বিপ্লবের ওপর তার বিশ্বাস থাকতে হবে। কঠোর পরিশ্রমকে সে ভয় করলে চলবে না। তাকে সংযমী ,পরিশ্রমী,ছদ্মবেশে পটু হতে হবে। যেহেতু জনগণের সহায়তা ছাড়া কখনও বিপ্লব সম্ভব হতে পারে না ,একজন বিপ্লবীকে সুযোগ পেলেই জনগণের মতামত জানার চেষ্টা করতে হবে। নিজের কর্ম এবং স্বভাবের দ্বারা

তাদেরই একজন হয়ে তাদের মধ্যে জাগরণ ঘটাতে হবে। বাঁশের তৈরি একটা ঘরে পিলটিকেল ক্লাস নিচ্ছে দিহাঙ। এই ক্লাসে দেশের রাজনীতির সঙ্গে পৃথিবীর সফল বিপ্লবগুলি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এমনকি যে সমস্ত বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে দিহাঙ তার কারণগুলিও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখায়। সে মনে করে যে সমস্ত বিপ্লব সফল হল না তার থেকে শিক্ষা লওয়াটা বিশেষভাবে জরুরি। আত্মা দৃঢ় না হলে ,হৃদয়ে ঐকান্তিকতার অভাব হলে কেবল শারীরিক শ্রম ,মারনাস্ত্র এবং কষ্টসহিষ্ণুতার দ্বারা বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না।

মাও সে তুঙ বলেছিলেন --প্রিয় বিপ্লবীর কথা দিয়েই দিহাঙ পুনরায় শুরু করে। --শত্রুকে আক্রমণ করার সময় প্রথমে কেন্দ্রকে আঘাত করবে না। ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে থাকা শত্রুকে আক্রমণ করবে এবং শত্রুর মানসিক বল দুর্বল করে দেবার চেষ্টা করবে। তারপরে একত্রিত হয়ে থাকা শত্রুকে আক্রমণ করবে। তোমরা সংখ্যায় কম হলেও সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হবে এবং শত্রুকে কখনও জানতে দেবে না যে তোমাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়...।

ক্লাস শেষ হয়ে গিয়েছিল। কাল শিবিরে রেশন নিয়ে আসা নলবাড়ির ছেলেদুটির কাছ থেকে পাওয়া খবর দিহাঙকে বেশ চিন্তিত করে তুলেছে। অসমের বিশেষ করে নগরে শহরে সংগঠনের ছেলেরা নাকি ধন সংগ্রহ করার নামে যার তার উপর অত্যাচার করছে। সংগঠের স্থানীয় শাখার প্রধান যদিও বলেছে যে অসৎ উপায়ে ধন সংগ্রহ করা সমাজের শত্রুদেরই তাঁরা ধন সংগ্রহের টার্গেটরূপে নির্ধারণ করেছে ,এই কথা সর্ব সাধারণকে আশ্বস্ত করতে পারে নি। সংগঠনের এই কাজ জনসাধারণের মনে ক্ষোভ আর ত্রাসের সঞ্চার করেছে। অন্যদিকে সহজেই অর্জন করা ধন দৌলতের দ্বারা অনেক সদস্য বিলাসিতা পূর্ণ জীবন যাপন করছে। এই সমস্ত দেখে শুনে জনগণ সংগঠনটার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। কে কার থেকে কত টাকা সংগ্রহ করেছে তার হিসেব নাকি শীর্ষ নেতাদের হাতেও নেই। হতাশা আর বিষাদ দিহাঙের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। কিন্তু একজন সত্যিকারের বিপ্লবীর মতোই সে ভাবতে চেষ্টা করে --হতাশাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। সংগঠনে যাকে তাকে ভর্তি করাটা বিরাট ভুল হয়ে গেছে। এই ভুল থেকে সংগঠনকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তী সাধারণ সভায় শীর্ষ নেতৃত্বের সামনে এই বিষয়টাকে গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত করতে হবে।

ফটফটে চাঁদের আলো। অসমীকে শুকনো লতাপাতার বিছানায় শুইয়ে রেখে এই মাত্র কিছুক্ষণ আগে দিহাঙ বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ছিটকে আসা চাঁদের আলো রূপোলি রঙ ধারন করে বাঁশের বেড়া এবং মাটির মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। অপার নিঃশব্দের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী ডুবে রয়েছে। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই। দিনের অরণ্য যেন মরে ভূত হয়ে গেছে। বিছানায় কিছুক্ষণ ছটফট করে দিহাঙ উঠে পড়ল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। একটা পাকা বেলের মতো চাঁদটা যেন ঝুলে রয়েছে। গাছের পাতাগুলি স্থির। কোথাও সামান্য স্পন্দন নেই। একটা রাতচরা পাখির ঢপঢপানির শব্দ দিহাঙের পাশ দিয়ে যেতে যেতে পুনরায় নৈঃশব্দতার মধ্যে মিলিয়ে গেল। দিহাঙ বুকে হাত রাখল। মনটা কেমন যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। ধেমাজির বিস্ফোরণের ঘটনাটা তার মনে ঝড় তুলেছে। বিপ্লবী এবং সাধারণ হত্যাকারীর মধ্যে আজ সমস্ত পার্থক্য দূর হয়ে গেছে। শিশুর রক্তে ভিজে উঠা মাটিতে কার জন্য স্বাধীনতা আসবে ? নৌতিক প্রশ্ন উঠেছে --সংগঠনের বাইরে এবং ভেতরেও। দিহাঙের নিজেকে পুতুল নাচের একটা পুতুলের মতো মনে হচ্ছে । অদৃশ্য অঙ্গুলির তালে অদৃশ্য সুতো যেন তাঁদের জীবনটাকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। চাঁদটা কিছুক্ষণ একটা কোমল মেঘের আস্তরণের আড়ালে লুকিয়ে রইল। পশ্চিম আকাশ থেকে বড় বড় মেঘ একটা নৌকার মতো ভেসে আসছিল--ছোট একটা মেঘকে সঙ্গী পেয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল। চাঁদটা পুনরায় হেসে উঠল। চাঁদে র গায়ের তুলসির দাগটার দিকে এবার দিহাঙ তাকিয়ে রইল। যেন দূর অতীত থেকে ভালো লাগা একটা সুরকে স্মৃতি কুড়িয়ে আনল। --তুসির তলে মৃগ পহু চরে .....মায়ের করুণ মুখটা একবার চোখের সামনে ভেসে উঠেই মেঘের আড়ালে মিলিয়ে গেল। কী কষ্ট,কী তীব্র সেই স্মৃতির আঁচর। দিহাঙের বুকটা ব্যথা করছে....গভীর ভাবে স্মৃতি তার আঁচর বসিয়েছে নাকি ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাওয়া বুকটাতে দিহাঙ তার হাত রাখল। ক্ষতস্থানটা মেরামত যোগ্য হল। কে দেবে বুকের ক্ষতস্থান সেলাই করার মতো একটা সূচ--জোনবাই। নিঃশব্দ আকাশ আর অরণ্যকে কুড়ে কুড়ে মৌনতায় হাহাকার করে উঠল দিহাঙের মনটা।

জোনবাই একটা সূচ দাও ...চাঁদটা কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করল না -সূচ দিয়ে কী হবে

পেন্টের পকেট থেকে দিহাঙ মবাইল ফোনটা বের করল। পার্স খুলে একটা সিম । গতকাল নলবাড়ির ছেলেগুলি এনেছিল। দ্রুত হাতে দুটো নম্বর টিপল দিহাঙ। তারপর থেমে গেল। ও কি এখনও জেগে আছে । পাইন বনের শিস শুনতে শুনতে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।বিষাদঘন চোখ দুটিতে হয়তো নেমে আসছে একটা স্বপ্ন। এমতাবস্থায় তাকে ঘুম থেকে জাগানো যায় কি। দিহাঙ

দিহাঙ কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর শিবির থেকে কিছুটা নেমে গিয়ে একটা সোনারু গাছের নিচে দাঁড়াল। নাম্বারটা পুনরায় ঢায়াল করার সময় দিহাঙ ভাবল --পারা যায়। একমাত্র তারই ঘুম আর স্বপ্নের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করতে পারে সে। দিহাঙ জানে--তাঁর স্বপ্ন এবং নিদ্রাতেও তার অস্তিত্ব ছড়িয়ে রয়েছে। নাম্বার ডায়াল করে তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটা খুব স্বাভাবিক কণ্ঠ শোনা গেল।

হ্যালো কে বলছেন ? দিহাঙের মনে হল মা হয়তো ঘুমোয় নি। ফোনের অপেক্ষায় মা হয়তো বসেছিল। আমি বলছি --দিহাঙের গলাটা কেঁপে ওঠল।

কেমন আছিস খুব স্বাভাবিক সেই কণ্ঠ। যেন বেড়াতে যাবার সময় পথে আলাপ হওয়া একজন কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করছে।

---তোমার কোলে মাথা রেখে শুতে ইচ্ছা করছে মা। অনেক রাত আমার ভালোভাবে ঘুম হয় নি। --দিহাঙের গলা ধরে এল। ফোনের ওপারে পাথরের মতো শীতল আর কঠিন নীরবতার স্তূপ। দিহাঙ কান খাড়া করে রইল। সে কি একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাবে ? অথবা চোখের জলে কাদা মাটির মতো নরম করে তোলা একটা কোমল কণ্ঠস্বর--নীরবতার কঠোর পাথর অতিক্রম করে যা তার গলাকে ঘিরে ধরবে। না ,সেরকম কিছুই হল না। নীরবতা ভঙ্গ করে মায়ের দৃঢ় কণ্ঠস্বরটাই তার কানে ভেসে এল।

ভেঙ্গ পড় না। যদি মনে কর ওপথ তোমার জন্য নয় ,তাহলে ফিরে আসারও উপায় আছে। --

ফিরে আসার পথ নেই মা। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। --দিহাঙ গভীরতার সঙ্গে বলল। পৃথিবী জুড়ে চাঁদের আলোর বাণ ডেকেছে। অথচ তার মনে হল তার মায়ের জগৎ টা যেন অন্ধকারের মধ্যে ডুবে রয়েছে। ছিদ্রহীন নীরবতার মধ্য দিয়েও দিহাঙ অনুভব করল ফোনের ওপারে বিচলিত হতে শুরু করেছে শামুকের মতো খোলার ভেতরে বসবাস করা তার মা। দিহাঙ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। এই যে নৈঃশব্দের একটা সাঁকো --আর তার ওপারে রয়েছে তার জন্মদাত্রী এবং এপারে সে --মাঝের শূন্যতায় পাক খেতে খেতে পরিপুষ্ট হয়েছে নৈঃশব্দের মহড়া--কিন্তু এই হাহাকারের মধ্যেও তার বুকের ক্ষতে কেউ কি মমতামাখা আঙ্গুল বুলিয়ে দিচ্ছে না।

'মা তুমি কেমন আছ ? অনেকক্ষণ পরে দিহাঙ জিজ্ঞেস করল। আমার জন্য চিন্তা কর না--আমি ভালো থাকব। খোলের ভেতরে নিজেকে আড়াল করতে করতে মা বলল। সুন্দর আকাশ --সুন্দর অরণ্য আর বুকের বিষাদ। মাকে একটু যদি সুখি করা যেত। হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ে গেল দিহাঙের। 'মা ,তুমি একটা অপেক্ষা কর ,ফোনটা ধরে থেক। দিহাঙ কথাটা বলেই একটা ছোট ছেলের মতো শিবিরের উদ্দেশে দৌড় লাগাল। বালিশের কাছ থেকে বাঁশের তৈরি একটা বাঁশি নিয়ে পুনরায় ফিরে এল। শার্টের পকেটে আলগোছে ফোনটা রেখে দিল। সোনারু গাছে হেলান দিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিল।

একটা সুর,যেন মাটি থেকে ,জল থেকে গাছের শিকড় থেকে থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াল এবং গাছ গুলির ঘুমন্ত শরীর স্পর্শ করে ,জ্যোৎ স্নাকে সঙ্গে নিয়ে সুরটা শূন্যতায় পাক খেতে খেতে উড়তে লাগল। দিহাঙের সেলাই করতে না পারা বুকের ক্ষত থেকে নিঙড়ে নিঙড়ে বেরনো রক্তের মতো উজজল এবং মর্মন্তুদ সেই সুরের গায়ে ঘসা খেয়ে জ্যোৎ স্নাটুকুও করুণ হয়ে পড়ল।

' মা,এই সুরটা তোমাকে দিলাম --কিছুটা থমকে থেকে দিহাঙ মাকে বলল আর পুনরায় বাঁশিতে ফুঁ দিল।

শিবিরে ঘুমিয়ে থাকা ছেলেদের মুখের উপরেও ঘূর্ণমান ছায়া হয়ে বাঁশির সুরটা ছড়িয়ে পড়ল। দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ওদের বন্ধ চোখের পাতায় সুরটা তার কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিল। দুই একজন চোখ মেলে তাকাল। নয়ন আর জঙ্কি বাইরে বেরিয়ে এল। তারা দেখল জ্যোৎ স্না এবং বাঁশির সুরে স্নাত হয়ে সমস্ত অরণ্য মায়াময় হয়ে উঠেছে। জঙ্কি বুকে হাত রাখল। বিষাদের মতোই কুড়ে কুড়ে ভেতরে প্রবেশ করছে বাঁশির শব্দ। নয়ন বনানির ওপর বসে পড়ল।

'স্যারের কোনো প্রেমিকা আছে নাকি নয়ন ? '---জঙ্কি জিজ্ঞেস করল। যেন কোনো প্রেমিকই বাঁশিতে এ ধরনের সুর তুলতে পারে। নয়ন চুপ করে রইল। জাহ্নবীর কথা জঙ্কিকে বলটা ঠিক হবে না। কাউকে বলা যাবে না।

(৪)

ভূটিয়া কবিরাজ যাবার জন্য প্রস্তুত হল। সাবান ,সেমপু এবং গান শোনার একটা পেয়ে সে বিরাট খুশি। তাঁর চিকিৎ সায় পাঁচ দিনের মধ্যেই অসমী যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠল। পেছনের পায়ে কবিরাজের ব্যাণ্ডেজ নিয়ে সে মুহূর্তের জন্য দাঁড়াতেও পারছে। দিহাঙের মুখেও হাসি দেখা দিয়েছে। এই কয়েকদিন যতটা সম্ভব সে অসমীর সঙ্গে রয়েছে। তার ঘরের বারান্দায় অসমীর জন্য বাঁশ দিয়ে ছোট একটা জায়গা ঘেরাও করে দেওয়া হয়েছে। পাহাড় ,অরণ্য একাকার করে কুড়িয়ে আনা বন্য ঔষধ কবিরাজ নিজের হাতে পিষে অসমীকে খাইয়েছে। পায়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে। দিহাঙ আর নয়ন বিলের পাশের ঝোপ থেকে কোমল ঘাস কেটে এনেছে।

অসমীর চোখের আগের সেই ভীতির ভাবটা দূর হয়েছে। জীব জন্তুরা ভালোবাসা ঠিকই বুঝতে পারে--অসমীর চোখের দিকে তাকিয়ে কথাটা দিহাঙ নতুন করে উপলব্ধি করেছে। যাবার সময় কবিরাজ দিহাঙের হাতে দুটো মুক্তো তুলে দিল। একটির রঙ গাঢ় সবুজ,অন্যটির রঙ গাঢ় মেরুণ। সবুজ রঙের মুক্তোটির নাম যু।উঁচু পাহাড়ে এক ধরনের বিশেষ শিলার মধ্যে এই মুক্তো পাওয়া যায়। ভূটান এবং তিব্বতের মানুষেরা বিশ্বাস করে যে এই ধরনের মুক্তো মানুষকে নানা রোগের হাত থেকে রক্ষা করে।

কবিরাজ বললেন --মেরুণ রঙের মুক্তোটি অত্যন্ত দুর্লভ প্রজাতির। বজ্রপাত হয় এমন একটি জায়গার এক রকমের পোকার শরীর থেকে এই ধরনের মুক্তো সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বজ্রাপতের মতো নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম চির নামের এই মুক্তো মানুষের সঙ্গে থাকলেও মানুষ নানারকম রোগভোগের হাত থেকে রক্ষা পায়।

তোরা ভালো কাজ করছিস । এই দুটো তোদের কাজে লাগবে। ---খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বলল কবিরাজ। কৃতজ্ঞতা জানানোর মতো কোনো ভাষা ছিল না দিহাঙের। যেতে উদ্যত কবিরাজকে সে কেবল ধন্যবাদ জানিয়ে বলল --লগ জাগে রিন পচ্ছে (শুভরাত্রি হে গুণময় ঈশ্বরের দূত) ।

অসমী দুপুরের আহারের পর ঘুমিয়ে পড়েছে। পলিটিকেল ক্লাস শেষ করে দিহাঙ শিবিরের দক্ষিণ দিকে থাকা টিলার হেলানো পাথর একটার ওপর এসে বসেছে। একমাস পরেই সে ভূটানের সি এস কিউ তে যাবে। ভূটান শিবিরের সবাই এখন কিছুটা উদ্বিগ্নতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ভারত সরকারের চাপে পড়ে আগের বন্ধুভাবাপন্ন ভূটানের রাজা এবং নেতৃবর্গের কথার সুরও নাকি অনেকটাই বদলে গেছে।

অবশ্য দিহাঙ আগে থেকেই এরকম একটা সন্দেহ করছিল। যে রাষ্ট্র নিজের দেশের জনগণকে মৌলিক স্বাধীনতাটুকু পর্যন্ত ভোগ করতে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে ,সেই অন্যদেশের মুক্তিকামী মানুষের বন্ধু হবে কীভাবে। দেশটির জনগণের প্রধান জীবিকা হল কৃষি আর পশুপালন। উপযুক্ত বাজারের অভাবে তারা উৎ পাদিত সমস্ত শস্য এবং ফল মূল অত্যন্ত কম দামে ভূটানের সরকারকে কম দামে বিক্রি করতে হয়। তাছাড়া দুঃখি কৃষকরা বিনা পারিশ্রমিকে সরকারি আমলাদের বিভিন্ন ভাবে সেবা করতে বাধ্য হয়। প্রথমবারের জন্য ভূটান গিয়ে দিহাঙ রীতিমতো অবাক হয়েছিল। শোষক শ্রেণীর সর্বগ্রাসী শাসন ব্যবস্থা ভূটিয়াদের স্বাভাবাক জীবন যাপনের অধিকার অতীত থেকেই খর্ব করে আসছে। সহজ সরল পাহাড়ি মানুষগুলি এমনকি প্রতিবাদের উপযুক্ত ভাষাও জানে না। একটা কথা দিহাঙ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে কেবল দুর্গম পর্বত গুলির জন্যই নয় পুরনো শান ব্যবস্থা এবং এবং রীতিনীতির জন্যও ভূটান এখনও সভ্য সমাজ থেকে বেশ পিছিয়ে রয়েছে। সি এস কিউ থেকে খবর এসেছে ভূটান সরকারের সহযোগিতায় ভারতীয় গুপ্তচর বাহিনি শিবিরের আশেপাশে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশ্য এখনও রাজা শিবির থেকে নেতাদের উদ্দেশে উপঢৌকন পাঠানো বন্ধ করে নি। আগন্তুক সাধারণ সভায় এই সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা হবে। তাছাড়া সংগঠনের আভ্যন্তরীণ কিছু পরিবর্তনও ঘটানো হবে। মধ্যমবর্গীয় কিছু নেতার ক্ষমতা হ্রাস করা হবে।

অসমের যাবতীয় কাজ কর্ম এবং আন্তঃগাঁথনি সমপর্কীয় সমস্ত তথ্য দিহাঙকে সি এস কিউ তে নিয়ে যেতে হবে। তথ্য সংগ্রহের জন্য কাজে নেমে পড়েছে নয়ন এবং রাজন। আপার অসম থেকে সমস্ত তথ্য নিয়ে আসা একজন নেতার সঙ্গে তাঁরা সেখানেই দেখা করবে।

পাথরের উপর একা বসে থাকা দিহাঙের চোখ পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে নেমে গেল। আঃ কি সুন্দর শ্যামল রঙ। বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে অরণ্য--তার ওপাশে বিশাল মাঠ। দূরের গ্রামগুলি এখান থেকে ভালোভাবে দেখা যায় না। কখনও বা রাতে বৃষ্টির মধ্যে মাছ ধরতে আসা মানুষের জ্বালানো টর্চের আলো এখান থেকেই চোখে পড়ে। বৃষ্টি এবং অন্ধকারের মধ্যে চোখে পড়া সেই আলোর বিন্দুগুলির যে কী শক্তি। স্বাভাবিক জীবনের প্রতীক হয়ে সেই আলোর বিন্দুগুলি ছেলেদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। দিহাঙ অনুভব করে শিবিরটা স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। ছেলেগুলি হয়তো কাঠ কুড়োতে গেছে অথবা কোথাও বিশ্রাম নিচ্ছে। অবশ্য আজ শুধু মাত্র পাঁচ জন ছেলেই শিবিরে রয়েছে । বাকিরা সবাই নানা কাজে নিচে গেছে।

দিহাঙ কিছুটা নিঃসঙ্গ বোধ করে। কখনও কখনও মানুষকে একা হতে হয়। অন্ততঃ নিজের ভেতরে উঁকি মেরে দেখার জন্য। নিজের ভেতর উঁকি মেরে দেখেছে সে--কী দেখতে পেয়েছে। স্বাধীনতার স্বপ্ন ,আর তো কিছুই নেই সেখানে। আবছা আবছা দেখতে পাওয়া দূরের সেই তুষারাবৃত গিরিশিখরের মতো এক আকাঙ্খাহীন আত্মা সে। কিন্তু আজ খুব সঙ্গোপনে তার মনে একটা আকাঙ্খা জাগছে না কি নিজের জন্য একটু একটু করে বেঁচে থাকা তার কবিসত্বার জন্য ।

সামনের শহরে আজ রাতে কবিতার আসর বসবে। দিহাঙের এক কবি সাংবাদিক বন্ধু খবর পাঠিয়েছে। সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত এ ধরনের কবিতার অনুষ্ঠানের মধ্যমণি ছিল দিহাঙ। একান্ত ব্যক্তিগত জীবনে এই এক দুর্বলতা তাঁর। শৈশব থেকেই সে কবিতার সঙ্গে কথা বলেছে,একা হলেই কবিতার বুকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়েছে,কবিতার হাতে হাত রেখে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চলেছে। বন্দুক তুলে নেওয়া হাতেও সে কবিতার নিষ্পাপ শরীর স্পর্শ করেছে--সে ছাড়তে চাইলেও কবিতা তাকে ছাড়ে না। বুকের ভেতর একটা রূপোলি গাছের শিকড়ের মতো ক্রমশ বেড়ে চলে তা।

দূরের শহরে মাটির প্রদীপের আলোতে আজ কবিতাগুলি অপার্থিব হয়ে উঠবে। দিহাঙের সেই আসরে যোগদান করতে ইচ্ছা করছে। মধ্যমণি হয়ে নয়, নো বডি হয়েই আসরের এক কোণে সে যদি সবার অলক্ষ্যে বসে থাকতে পারত। আজকাল হয়তো এসমস্ত অনুষ্ঠানগুলিতে জাহ্নবী আসে। দিহাঙ জানে না। কিন্তু স্নিগ্ধ ফর্সা একটি মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে চায়। একজোড়া কাতর চোখের মায়ায় এধরনের অনুষ্ঠানগুলিতে কখন যে হারিয়ে যেতে চেয়েছিল বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা তার দৃঢ় চোখ দুটি। রাজনীতি বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্রী জাহ্নবী কখনও তার পথকে সমর্থন করে নি। 'এরকম কোনো স্বপ্ন দেখা ভালো যা বাস্তবে রূপায়িত করা যায়। ---গহীনভাবে জাহ্নবী বলেছিল। কিন্তু বিপ্লবীর আড়ালে থাকা সেনসিটিভ কবিতা লেখা ছেলেটিকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল।

দিহাঙ বুকে হাত রাখে। শেফালি ফুলের গন্ধ মাখা জাহ্নবীর চুলের গন্ধ এবং চোখের জলের দাগ এখনও যেন তার বুকে লেগে রয়েছে।

সোনারু ফুলা

এই অরণ্যে

তোমার আলো -ছায়া মুখ

বুকের মেরুদণ্ডে কে রাখে

একটি নির্জন হাত

আমার দুঃখ গুলিকে সেলাই করতে পারার মতো করে।

না ,না । এভাবে হয় না। দিহাঙ নিজের মনটাকে শাসন করতে চাইল। কঠোর হতে হবে। অতীত বর্তমান ভুলে গিয়ে ভবিষ্যৎ কে উদ্ধার করার জন্য সে মাকে ত্যাগ করে এসেছে। পরিচিত মুখগুলিকে ,স্বাভাবিক জীবনকে ছেড়ে এসেছে। আর মাঝে মধ্যে এই যে তার চোখের কোণ ভিজে উঠতে চায় --এ তো অশ্রু নয়,ছাই। সুখি সোনালি মুহূর্ত গুলির স্মৃতির ছাই--যাকে নিজের হাতে সে সময়ের চিতায় তুলে দিয়েছিল।

ঈশান আকাশে মেঘ জমেছিল। দিহাঙের চোখের সামনে মেঘের টুকরো বন্যার জলের মতো ফুলে ফেঁপে এল এবং আকাশের একটা বড অংশ ঢেকে ফেলল। হঠাৎ দিহাঙের মনে পড়ল আজ শিবিরে একজন লিঙ্ক ম্যান আসার কথা ছিল। কাজ কর্মে বেরিয়ে যাওয়া ছেলেগুলির ফিরে আসার সময় হয়েছে। মনের উদাসীনতা আর মৃত আকাঙ্খার শরীর সামলে নিয়ে দায়বদ্ধ বিপ্লবী নেতার মনোভাবকে জাগিয়ে তুলতে দিহাঙের মাত্র কয়েকমিনিট সময় লাগল। ব্যস্ত পদক্ষেপে সে গোভার খোঁজে শিবিরের ভেতরে চলে গেল।

জ্বালানি আর ফলমূলের খোঁজে যাওয়া ছেলেগুলি ফিরে এসেছিল। খুব দ্রুত কালো মেঘ সারা আকাশটিকে ছেয়ে ফেলল। বিকেলে শেষ সন্ধের মতো গাঢ় হয়ে এসেছিল অন্ধকার। বাতাসও বইছিল।

'এইবাৰ ঝড় তুফান বেশি হচ্ছে নাকি --গোভা নিজেৰ মনেই বলল। এই কদিন ধৰে ৰোজই বিকেলেৰ দিকে ঝড় তুফান হচ্ছে। পাহাড় ডিঙ্গিয়ে কাউকে শিবিরে প্রবেশ করতে হলে ঝড় বৃষ্টিতে বড় অসুবিধে হয়। দিহাঙ কিছুই বলল না। বাইরে থেকে অসমীকে তার ঘরে নিয়ে এল। বাঁশের চেয়ার একটা টেনে নিয়ে দরজারমুখে বসে পড়ল। আদুরে শিশুর মতো তার কোলো অসমী মাথা গুঁজে দিল।

আকাশে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। তারপরে আকাশ মাদলের শব্দে ছেয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দিনের শান্ত অরণ্যানী উন্মত্ত হয়ে উঠল। আকাশ ভেদ করে হরহর করে বৃষ্টি নেমে এল। ....আর সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে দিহাঙ দুটো অস্পষ্ট অবয়বকে দ্রুত শিবিরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। একজন লিঙ্কম্যান এবং অপরজন সংগঠনের নলবাড়ির সদস্য। লিঙ্কম্যান পুঁজি সংগ্রহ সংক্রান্ত অনেক তথ্য দিল দিহাঙকে। মানুষকে অপহরণ করে মুক্তির জন্য টাকা চাওয়া ব্যাপারটাকে দিহাঙমনপ্রাণ দিয়ে ঘৃণা করে। কিন্তু সংগঠনের শীর্ষ নেতারা সংগঠনের আর্থিক ভাণ্ডারকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য অপহরণকেই উপায় হিসেবে গণ্য করেছে। অন্যদিকে ,ভয় দেখিয়ে ধন সংগ্রহ করে গুয়াহাটির বেশ কিছু ক্যাডার নাকি মারুতি নিয়ে বিলাসিতা শুরু করেছে। অনেকে এই সুয়োগে ব্যক্তিগত সুখ আহ্লাদ

চরিতার্থ করার চেষ্টা করছে। সংগঠন সমপর্কে মানুষ এখন সহানুভূতিশীল হওয়ার পরিবর্তে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

খবরগুলো অবশ্য খুব একটা নতুন ছিল না। কিন্তু দিহাঙ পুনরায় বেদনাহত হল। ওদের ত্যাগ আর প্রকৃত স্বাধীনতার স্বপ্নকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে কি এই সব ভুঁইফোর সব তথাকথিত বিপ্লবীরা। জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে বসবাস করে ওরা কীভাবে জনসাধারণের আশা আকাঙ্খার মতামত বুঝতে পারবে।

একটা খারাপ খবরও ছিল। শিবিরের একেবারে কাছের গ্রামটিতে নাকি মাঝেমধ্যে আর্মিরা টহল দিতে শুরু করেছে। সেই গ্রামে থাকা সংগঠনের পাহারাদারিতে থাকা ছেলেদের খুব সতর্ক থাকতে হচ্ছে। দিহাঙকে চিন্তিত দেখা গেল। একবার নিজে গিয়ে পরিস্থিতিটা ভালোভাবে দেখে আসতে হবে--সে ভাবল।

'স্যার ,আপনার জন্য একটি সুন্দর উপহার আছে। --নয়ন নাটকীয় সুরে বলল। কি ? দিহাঙ খুব একটা গুরুত্ব দিল না। এই কিছুক্ষণ আগে নয়ন এবং রাজন নিচ থেকে এসেছে। তারা অনেক খবর এবং নথিপত্র নিয়ে এসেছে। কিন্তু দিহাঙ পলিটিকেল ক্লাসটা ক্ষতি করতে চায় না। 'মুখ হাত ধুয়ে কিছু একটা মুখে দিয়ে ক্লাসে চল। ক্লাস থেকে ফিরে এসে কথা বলব।'--দিহাঙ বলল। এই যে --ক্লাসের জন্য রেডি হয়ে নয়ন দুষ্ট চোখ জোড়া তুলে দিহাঙের দিকে তাকাল।

'কাগজ কলম এনেছিস বোধহয়,না হলে বই । হাসতে হাসতে তার দিকে তাকিয়ে থাকা নয়নকে লক্ষ্য করে দিহাঙ বলল। নয়ন পেন্টের পকেট থেকে একটা ক্যাসেট বের করে দিল। কিসের ক্যাসেট ? দিহাঙ জিজ্ঞেস করে। শান্তনুদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনার জন্য পাঠিয়েছে। কবিসম্মেলনে রেকর্ড করে রেখেছিল।

যতটা সম্ভব নির্লিপ্তভাবে নয়নের কাছ থেকে ক্যাসেটটা নিয়ে শার্টের পকেটে ভরে দিহাঙ ক্লাসরুমের দিকে এগিয়ে যায়। শিক্ষক হিসেবে পাঠদান করার পরিবর্তে দিহাঙ আলোচনার মধ্য দিয়ে কথাগুলো বুঝিয়ে দিতে বেশি পছন্দ করে। এর ফলে ছেলেদের আগ্রহও বাড়ে এবং তাদের মতামতও জানতে পারা যায়। 'তোদের কারো জিজ্ঞেস করার মতো কিছু আছে নাকি ? দিহাঙ সতীর্থদের কাছ থেকে প্রশ্ন আহ্বান করে। 'ভারতের অত্যাধুনিক অস্ত্রে বলবান বিশাল সেনাবাহিনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা জয় লাভ করতে পারব কি ?অসমকে স্বাধীন করতে পারব ? --মানস নামে শিবসাগরের ছেলেটি জিজ্ঞেস করল।

শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে প্রথমে আমাদের শত্রুর দুর্বলতা গুলি জানতে হবে। ভারত রাষ্ট্র অত্যাধুনিক অস্ত্রে শক্তিশালী একথা সত্য। কিন্তু এই রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল ভারতের কোনো অঞ্চলেরই জনগণ পুরোপুরি রাষ্ট্রের পক্ষে নয়। প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই একটা রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি কাজ করে চলেছে। তা সশস্ত্র দলই হোক বা অহিংস মতবাদে বিশ্বাসী দলই হোক। মাও সে তুঙ বলেছিলেন --আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাইরে থেকে যতই শক্তিশালী হোক না কেন ভেতরে ভেতরে বেশ দুর্বল। কারণ গণশক্তি থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। ....আমাদের কাজ হবে জনগণকে রাষ্ট্রের শোষণ সমপর্কে সচেতন করে তোলা। তাদেরকে সহজ সরল ভাষায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া। তাঁরা যখন আমাদের সংগ্রামের অর্ন্তনিহিত তাৎ পর্য উপলব্ধি করতে পারবে ,তখন তাঁরা আমাদের সঙ্গে আসবেই। এই বৃহৎ গণশক্তিকে ভারতের বেতনভোগী আর্মি কখনও মেরে শেষ করতে পারবে না। আরো একটা কথা মনে রাখবে। যদি আর্মির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ,তাহলে মনটা স্থির রাখতে হবে এবং শুদ্ধ ডিসিশন নিতে হবে। তাদের হাতে আমাদের চেয়ে আধুনিক উন্নতমানের অস্ত্র থাকতে পারে ,কিন্তু তারা আমাদের চেয়ে শক্তিশালী নয়। কারণ তারা যুদ্ধ করে চাকরি হিসেবে ,মৃত্যুভয় সঙ্গে নিয়ে । কিন্তু আমরা একটা আদর্শকে সামনে রেখে যুদ্ধ করছি। সংগঠনে যোগদান করার সময় বুলেট কামড়ে মৃত্যুভয়কে আমরা পদদলিত করে আসি। আমরা অনেক আগেই জানি --আমাদের পথ অনিশ্চিত,দীর্ঘ --মৃত্যু যেখানে সেখানে ওৎ পেতে রয়েছে।

ছেলেরা অর্থনৈতিক মুক্তির কথা জিজ্ঞেস করে। দিহাঙ তাদের সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দেয়। ভারতীয় বাজার ছাড়াও পূর্বের দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য গড়ে তুলতে পারার বিপুল সম্ভাবনার কথা বলে । স্বাধীন অসমের কল্পনায় ছেলেদের চোখগুলো চুলু চুলু হয়ে ওঠে। তাঁরা একটি ব্যালেন্সড সমাজের স্বপ্ন দেখে। দুঃখি গ্রামগুলি স্বাধীনতার যাদুকাঠির স্পর্শে সুজলা শ্যামলা হওয়ার স্বপ্ন দেখে। সেই স্বপ্নে সুখ এবং সমৃদ্ধি অসমের শোষিত জনগণের হাতে। তাঁদের সংকল্প দৃঢ় হয়। পরস্পর পরস্পরের দিকে বিশ্বাসভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। ---অসম স্বাধীন হবেই। হয়তো আমাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই স্বাধীনতা আসবে। এই সংগ্রাম বৃথা যাবে না। --দিহাঙ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে ওঠতে চায়। কিন্তু কী এক আবেগ যেন তার কণ্ঠস্বরকে রোধ করে ফেলে।

সংগঠনের আন্তঃগাথনিক বিষয়ে নয়নদের আনা কিছু তথ্য দিহাঙকে অসন্তুষ্ট করে তোলে। গৈরিক বর্মন নামে স্থানীয় যুবকটিকে গুয়াহাটিতে পুঁজি সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত দলটির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গৈরিককে দিহাঙ অনেকদিন আগে থেকেই জানে। দিসপুরের

অনেক দালালের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সমপর্ক। নয়নের আনা খবর অনুসারে সংগঠনের পরিচয় দিয়ে দাদাগিরির অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। অন্যদিকে ,লক্ষীপাথারের শিবিরে থাকা সংগঠনের নিজেদের কারাগারের ভেতরের লোমহর্ষক খবর দিহাঙকে স্তম্ভিত করে দিল। সভ্য মানুষ এধরনের বর্বরোচিত কাজ করতে পারে কি ? চোখ উপড়ে নিয়ে,হাত কেটে ফেলে মানুষকে হত্যা করার নির্দেশ সংগঠন কীভাবে দিতে পারে ? তাহলে বিপ্লবী আর বর্বর হত্যাকারীর মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায় ? জাতিদ্রোহী একজনকে যদি হত্যাই করতে হয় ,তাহলে বন্দুকের দুটি গুলিই যথেষ্ট নয় কি ? এর সঙ্গে অসমে বসবাস করা ভারত রাষ্ট্রের হিন্দিভাষী নাগরিকের বিরুদ্ধে হুমকি এবং হত্যার যে কার্যপন্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা একেবারে অকল্পনীয়। খেটে খাওয়া মানুষের পরিবর্তে অসমের ধন বাইরে নিয়ে যাওয়া বণিকদের হুমকি দেবার পক্ষপাতী ছিল দিহাঙ। সমস্ত খবরাখবর গুরুত্ব সহকারে শুনে নথিপত্রগুলি দিহাঙ বিছানার নিচে গর্ত খুঁড়ে রাখা প্লাস্টিকের বাক্সে ভরে রাখে। সে যেন কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিল। তাঁদের বিবেকগুলিকে এভাবে বিক্ষিপ্ত করে তোলার জন্য সংগঠনের কিছু নেতার প্রতি দিহাঙের ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। সি এস কিউতে স্পষ্টভাবে সমস্ত কথা বলার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে রইল।

অসমীকে কোলে নিয়ে নয়ন এসে দিহাঙের পাশে বসল। ....এত বেশ আব্দার পেয়েছে স্যার। --অসমীর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে নয়ন বলল। দিহাঙ কিছুই বলল না। নয়নের মুখে এবং বাহুতে মাথা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে অসমী বোঝাতে চাইল যে সো কোল থেকে নামতে চায়। নয়ন তাকে নামিয়ে দিল। অসমী দিহাঙের গায়ে গা ঘষতে লাগল।

অসমী এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে পারে। সে এখন শিবিরের এমাথা থেকে ওমাথা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে বেড়ায়। সে বুঝতে পেরেছে এখানকার কোনো মানুষের কাছ থেকেই তার ভয়ের কিছু নেই। শিবিরের প্রত্যেকেই অসমীকে খুব ভালোবাসে। দল বেঁধে খাওয়ায়,কোলে নেয়। কেউ কোনো জায়গা থেকে আনা একটা সাদা পুঁতির মালা অসমীর গলায় আদর করে পরিয়ে দিয়েছে। মোটকথা দিহাঙ স্যারের চারপেয়ে অতিথি শিবিরের সবার কাছেই সম্মানিত অতিথি। 'অসমী --অ-স- মী ---দিহাঙ ডাকছে। সে সামনের দিকে দৌড়ে গেল। পায়ের ক্ষতটা ভালোভাবে দেখে দিহাঙ বলল --আমি সি এস কিউ তে যাবার আগে তোর পায়ের ঘা টা পুরো শুকিয়ে যাবে তো। তাহলে আমি ওকে ওর সঙ্গী সাথীদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসব।' নয়ন কিছু বলল না । সে ভেবেছিল অসমী তাদের সঙ্গে সবসময়েই থাকবে। তার বেশ দুঃখ হল।

দিহাঙ বিছানায় শুয়ে আছে। ব্যাটারিতে চলা ছোট্ট মিউজিক সিস্টেমটাতে বারবার ইতস্তত করে সিডিটা ভরিয়ে নিল সে। শান্তনুও পারে বটে। শান্তনু পেশায় গুয়াহাটির একটি ইংরেজি পত্রিকার সাংবাদিক। ভালো কবিতা লেখে। ওদের গ্রুপের কবিতার অনুষ্ঠানগুলির আয়োজনে শান্তনু সবসময়ই একটা অগ্রণীর ভূমিকা পালন করত। কবিতার নামে শান্তনু কাজে ফাঁকি দিয়ে গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়াতে পারে। তার এইসব কাজে কখনও কোনো ক্লান্তি নেই। কটন কলেজে পড়ার সময়েই শান্তনুর সঙ্গে দিহাঙের আলাপ। পরবর্তীতে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। দুজনেরই আদর্শ ছিল এক। পথ কিন্তু আলাদা হয়ে গেল। দিহাঙের সংগঠনের প্রতি তার নৈতিক সমর্থন রয়েছে। মিউজিক সিস্টেমটা একটু ঘড় ঘড় শব্দ করেই আরম্ভ হয়ে গেল। শান্তনুর কণ্ঠস্বর। শান্তনু অনুষ্ঠানটির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে । ...অনুষ্ঠান সঞ্চালক হিসেবে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই প্রিয় কবি অহিরণ বরুয়া....। অহিরণ বরুয়া ---ইস। সেই শিহরণ জাগানো বিপ্লবী কবিতাগুলির কবি অহিরণ বরুয়া--যে মানুষ আর প্রকৃতিকে নিয়েও কয়েকটি জনপ্রিয় কবিতা রচনা করেছে। দিহাঙের প্রিয় কবি সে। দিহাঙ মিউজিক সিস্টেমটাকে আরো একটু কাছে টেনে নিল। অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। দিহাঙের এরকম মনে হল যেন কবিতার অনুষ্ঠানটির এক অন্ধকারে কোণে বসে সে কবিতা শুনছে। কবিদের প্রায় সবাই তার পরিচিত। নবারুণ বর্মণ,পদুম তাঁতী,ভার্গব মেধী,ত্রিলোচন কলিতা,শ্যাম বরুয়া ...অনেকেই একটা সময়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

শান্তনুর একটি কবিতার স্তবক দিহাঙের খুব ভালো লাগল।

ওরা আমাদের বিবেকগুলি
বন্ধক রাখতে চায়
ছিন্নভিন্ন করতে চায় আমাদের আকাশ
বিনিময়ে
আমাদের নিঃস্ব হাতগুলিতে
ওরা নাকি তুলে দেবে

সান্ধ্য সূর্যের ঝলকানি।

....আমাদের বন্ধু দিহাঙ রাজগুরু আজ আমাদের মধ্যে নেই । আমি তাঁর একটা পাঠ করার জন্য সবার অনুমতি চাইছি। ---দিহাঙ চমকে ওঠল। কি যে করে শান্তনু। নিজের পুরনো কবিতা একটি ছোট্ট যন্ত্র থেকে ভেসে এল শান্তনুর কণ্ঠে এবং দিহাঙ তা স্তব্ধ হয়ে শুনল। --

এই পথেই আমি চলে যাব
এই নদী আর শ্যামলিমা ছেড়ে।
এই পরিচিত শহর ছেড়ে চলে যাব
স্বপ্নের বীজ বোনা বুকের প্রান্তর ছেড়ে যাব
ছেড়ে যাব তোমাদের পায়ে চলা সোজা পথটি ।
তাঁর লাবণ্য মাখা দুটি হাতে
আমার প্রেমিক দুটো হাত ছেড়ে যাব
তাঁর ঠোঁটে আমার শেষ কবিতাটা ।
তোমরা আমার কথা ভাববে কি
যখন দূরের আকাশে সূর্য অস্ত যাবে
আর পাখিরা
বাসায় ফিরবে ।

কড়তালির শব্দ শোনা গেল। দিহাঙের মনে পড়ল কাচিনে প্রশিক্ষণ নিতে যাবার আগে শান্তনুর ভাড়াঘরের বিছানায় শুয়ে সে এই কবিতাটা লিখেছিল। কে আই এর প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়ার পথ ঘাট খুব দুর্গম বলে সে শুনেছিল। লক্ষ্যস্থানে পৌছানর আগেই বহু ছেলে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। আর কিছু মরে বার্মিজ আর্মির গুলিতে। প্রথমবার যাবার সময় দিহাঙের একটু ভয় ভয় করছিল। কিন্তু সে তারপর আরও চারপাঁচ বার গেছে। ছেলেদের নিয়ে গেছে,কমাণ্ডার হিসেবে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গেছে। এখন তার এই যাত্রা খুব ভালো লাগে।

সিংফৌ ভাষায় সে ইতিমধ্যে বেশ দক্ষতা অর্জন করে নিয়েছে। দুর্গম পাহাড়ের ছোট ছোট নাগা গ্রামগুলিতে দিহাঙ বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। অসমের গো দাবা (অফিসার) এসেছে বলে জানতে পারলেই সমস্ত গ্রামের লোক এক জায়গায় এসে মিলিত হয়। ভোজের (পয়) আয়োজন করা হয়। প্রায় প্রত্যেক বাড়ি থেকেই ভোজের আসরে কিছু না কিছু পাঠানো হয়। মোষের মাংস, ভাত,কুমড়োর তরকারি,শুকনো মাছের চাটনি,শাকের তরকারি ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যঞ্জন। স্থানীয় মদও আছে। কিন্তু অসমের জিংখু (মিত্র) মদ খায় না বলে সবার জানা হয়ে গেছে। ভোজে নিজেরা মদ খেলেও দিহাঙের জন্য তারা গরম ফাখা (গরম জলে চা গাছের শুকনো পাতা দিয়ে তৈরি এক ধরনের পানীয়) এক গ্লাস এগিয়ে দেয়। একবার কাচিনে প্রশিক্ষণ নেবার সময় দিহাঙের মখলং হয়েছিল। মখলং হল আমাদের পরিচিত বসন্ত জাতীয় এক ধরনের মারাত্মক রোগ। তবে তা বসন্তের থেকেও মারাত্মক। সময়মতো চিকিৎ সা না হলে এই রোগে মৃত্যু অনিবার্য। চিরুং ঘরে (হাসপাতাল) দিহাঙের খবর নেবার জন্য নাগা গ্রামের মানুষদের ঢল নেমেছিল। কৃতজ্ঞতায় দিহাঙের দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। এই সহজ সরল নাগা লোকগুলি তার কোন জন্মের আত্মীয়। তখন অন্য সবাই মৃত্যু উপত্যকা বলে সম্বোধন করা এলকাটিতে দিহাঙ জীবনের এক নতুন রূপ দেখতে পেয়েছিল। দিহাঙ গভীর ভাবনার মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল।

সঞ্চালক কার নাম ঘোষণা করল ? জাহ্নবী দেবীর। জাহ্নবী দেবীই তো। দিহাঙ একটু কেঁপে ওঠে। যেন সাত সমুদ্রের পার থেকে ভেসে এল জাহ্নবী নামে তার এক সময়ের খুব আপন এক মেয়ের কণ্ঠস্বর। কবিতা নয়,জাহ্নবী রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে--

তুমি কেমন কর গান করহে গুণী

আমি অবাক হয়ে শুনি ....কণ্ঠস্বরটা যেন দিহাঙের সমস্ত সত্বাকে চুরমার করে দিচ্ছে। দিহাঙ দুচোখ মেলে ঘরের অন্ধকার দেখছে। অসহায় হাত দুটো বুকের মধ্যে রাখছে--যেন নিজেকে নিঃশেষ করে সে সুরের সঙ্গে মিশে যেতে চাচ্ছে। গান শেষ হল। 'আরও একটা আরও একটা ...আরও একটা গানের জন্য অনুরোধে শ্রোতারা মুখর হয়ে ওঠছে। জাহ্নবী এবার একটা গজল গাইছে। তার প্রিয় গোলাম আলির গজল--দিল মে এক লহর সি উঠি হ্যাঁয় আভি ...ভরি দুনিয়া মে জী নহি লগতা ,জানে কিস বাত কি কমি হ্যাঁয় অভি

...চেহারা কি বেচেরাগ গলিয়ে মে গলিয়ে মে জিন্দগী তুজকো ধুনতি হ্যাঁয় অভি ...মিউজিক সিস্টেমটা বুকে জড়িয়ে ধরে দিহাঙ বাইরে চলে এল। কৃষ্ণপক্ষের রাত। অরণ্যের নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যেও তার চোখ মিটমিট করে পরিচিত একটি মুখ খুঁজে বেড়াতে লাগল। তার চোখ জলে ভরে এল।

(৬)

দিহাঙ আর নয়ন যখন বরপাথার গ্রামের কাছাকাছি পৌছাল তখন রীতিমতো সন্ধে হয়ে এসেছে। দিহাঙ নয়নকে সঙ্গে আনতে চাইছিল না। দিহাঙ ভেবেছিল তাঁর অবর্তমানে অন্তত অসমীকে দেখাশোনা কররা জন্যও নয়নের শিবিরে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু তুই গেলে অসমীকে কে দেখবে বলার সঙ্গে সঙ্গে অসমীকে কোলে নিয়ে রাজন সামনে বেরিয়ে এসেছিল। 'আমি কেন রয়েছি স্যার,--আমি অসমীকে দেখব।'---রাজন বলেছিল। নয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে দিহাঙ বুঝতে পেরেছিল তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে। শিবির থেকে বেরিয়ে তাঁরা এক নাগাড়ে পাঁচ ঘন্টা পথ হেঁটেছে।

শিবিরের সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রাম বরপাথার। এই গ্রামে সংগঠনের একটা পাহাড়াদারের দলও রয়েছে। বরপাথারে কয়েকবার আর্মি এসে জিজ্ঞাসাবাদও করে গেছে। এই খবরটা যেন কী এক অশনি সংকেত বহন করে এনেছিল। তাই পরিস্থিত খতিয়ে দেখতে হিহাঙ নিজেই চলে এসেছে। গুয়াহাটি থেকে খবরাখবর এবং কিছু তথ্যাদি নিয়ে নিশান্ত নামের একটি ছেলেও এখানে আসার কথা। মাঠ থেকে ফিরে আসা গরুর হাম্বারব বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঝিঝির শব্দ এবং নামঘর থেকে ভেসে আসা খোল করতালের ধ্বনি শান্তি এবং পবিত্রতার এক আবহ মণ্ডল গড়ে তুলেছে।

গ্রামে প্রবেশ করার একটু পরেই একটি ছেলে এসে তাঁদের গোপন পথ দেখিয়ে একটি বাড়িতে নিয়ে গেল। সংগঠনের পাহাডার দায়িত্বে থাকা মণি। ছোট অসম টাইপের একটা ঘরের পেছনের বারান্দায় মণি তাদের বসতে দিল। 'এটা নরেন ডেকার ঘর। তিনি আমাদের ধন সংগ্রহ করার কাজে সাহায্য করেছেন। খবর আনা নেওয়ার কাজেও তাঁর অবদান রয়েছে--মণি বলল। মাথায় ঘোমটা দেওয়া আধবয়সী একজন মহিলা এসে তাদের তিনজনকে লাল চা আর চিড়া ভাজা দিয়ে গেল। 'আপনারা চা টা খেয়ে নিন। উনার ঠাকুর ঘরে ঢোকার সময় হয়েছে। প্রার্থনা শেষে আপনাদের কাছে এসে বসবেন। 'মাথা নিচু করে মহিলাটি চলে গেলেন। চা টা দ্রুত শেষ করে মণি ওঠে দাঁড়াল। 'স্যার,নিশান আসার সময় হয়ে গেছে,আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসি।'মণি বেরিয়ে গেল। সোফায় আরাম করে বসে সামনে একটা ম্যাগাজিন খুলে বসা নয়নকে একা রেখে দিহাঙ পেছনের ওঠোনে চলে এল। লাল মাটিতে সুন্দর করে লেপা বারান্দার এক কোণে ফুলগাছ। বেগুনি রঙের ফুলগুলি এখান সেখান থেকে ছিটকে আসা আলোতে ফুলগুলি জ্বলজ্বল করছে। দিহাঙ একটা ফুল শুঁকে দেখল। সামনের বারান্দার ঠাকুর ঘর থেকে প্রার্থনার মন প্রাণ জুড়ানো একটা সুর ভেসে আসছে। --

মুক্তিতে নিস্পৃহ যিনি সেই ভকতকে নমস্কার। রসময় মাগে ভক্তি ...। প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে একটা ধুপ ধুনোর গন্ধও দিহাঙের নাকে এসে লাগে। সমস্ত প্রার্থনারই এক অজানা শক্তি রয়েছে। দিহাঙের মনের মধ্যেও নিমেষেই প্রার্থনা তাকে অতীতের দিনগুলিতে নিয়ে যায়। মামার বাড়িতে প্রায়ই দিদিমাকে ঠাকুরঘরে নাকিসুরে প্রার্থনা করতে দেখেছে। অনেকসময় প্রার্থনা তাঁর কাছে কান্নার মতো মনে হত। দিহাঙের কেন জানি মনে হত সেই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দিদিমা ঈশ্বরের কাছে তাঁর মায়ের মঙ্গল প্রার্থনা করত। কুমারী কন্যার সন্তানের জন্মদান তাকে কম চোখের জল ফেলতে হয় নি।

শৈশবের অবোধ্য কথাগুলি কৈশোরের প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দিহাঙ বুঝতে পেরেছিল। দিদিমা বেঁচে থাকতে দিহাঙ মাকে কখনও প্রার্থনা করতে দেখেনি। কিন্তু মা কীর্তন-দশম,বেদ-ভাগবত সবই পড়েছিল। অবশ্য তাঁর সেই বিশেষ ভঙ্গিতে--আরাম চেয়ারে মাথা গুঁজে ,কালো মোটা ফ্রেমের চশমা পরে। দিহাঙ জেনেছিল বিশ্বসাহিত্যের পোকা মায়ের কাছে এই সব ধর্মগ্রন্থ ছিল না। ছিল সাহিত্য। কিন্তু অদ্ভুতভাবে দিদিমার মৃত্যুর পরে উচ্চ অসমের সেই বৃহৎ বাড়ির দেখাশোনার দায়িত্ব যখন বনমালীদাদুর হাতে অর্পণ করা হয়েছিল তখন দিহাঙ মা এবং জ্যেঠিকে ঠাকুরঘরে প্রার্থনা করতে দেখেছিল। কখনও প্রার্থনা না করা ব্যাঙ্ক অফিসার মা অধ্যাপক জ্যেঠি সাবলীলভাবে দিদিমার মতোই প্রার্থনা করছিল। এ ব্যাপারটা দিহাঙকে খুব অবাক করে দিয়েছিল।

প্রার্থনার শেষে একটা গামছা দিয়ে শরীর ঢেকে ধুতি পরা মানুষটা দিহাঙদের কাছে এল। পঞ্চাশোর্ধ বয়স। কিছুটা সমীহ আর অস্বস্তির সঙ্গে তিনি তাদের পাশে বসলেন। মানুশটার মুখে অজস্র বলিরেখা তার ছাপ ফেলেছে। সেসবের মাঝখান থেকে মানুষটার বিরক্তি আর ভয় দিহাঙের চোখে পড়ল। তার কাছে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা। 'আপনি নরেনের ডে ...? দিহাঙের কথা শেষ হবার আগেই ,মানুষটা যতটা সম্ভব বিরক্ত হওয়ার ভাবটা লুকোবার চেষ্টা করে বলে উঠলেন --আমি নরেনের পিতা। কিছুটা সময় নীরবে থেকে তিনি

পুনরায় বললেন--'তিনজন থাকার কথা বলেছে। বিছানা কিন্তু একজনেরই আছে। হয়ে যাবে কাকা। আমরা মানিয়ে নেব। দিহাঙের অনেক কিছুই জিজ্ঞাসা করার ছিল। কিন্তু মানুষটার গোমড়া মুখের দিকে তাকিয়ে কীভাবে কথা শুরু করা যায় তা ভেবে পেল না।

--নরেন...? নয়ন জিজ্ঞেস করল।

--গুয়াহাটি কী একটা কাজ নিয়ে গেছে। --মানুষটা উত্তর দিল।

---এই কয়েকদিন নাকি আর্মি এসেছিল এদিকটায় ? আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করেছে নাকি ?--নয়নও স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞেস করল। মানুষটার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি চোখদুটো তুলে ছেলে দুটির মুখের দিকে তাকালেন এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বললেন --বাবা,অসমিয়ায় একটা প্রবাদ আছে --দুই মোষের যুদ্দে বিরিনার মরণ । আমাদের মতো সাধারণ মানুষের এখন সেই একই অবস্থা হয়েছে।....তারপর তিনি বলতে লাগেলন কীভাবে দুই তিনবার আর্মি এসে বাড়ি বাড়ি ঢুকে সংগঠনের কথা জিজ্ঞেস করেছেন। দুই একজনকে মারধোরও করেছে। আর্মির পরেই সংগঠনের ছেলেরাও আসে। রাতে থাকে। খাবার দাবারও জোগাতে হয়। না হলে বন্দুক দেখিয়ে ধমক দেয়। তছাড়া আর্মিকে কিছু বললে বাড়ি শুদ্ধ লোককে বন্দুকের গুলিতে উড়িয়ে দেবে বলে ভয় দেখায়। গ্রামের মানুষেরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রয়েছে।

দিহাঙের কপালে ভাঁজ পড়ল। ব্যাপারটা খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে। ধমক দিয়ে খাবার দাবার আদায় করাটা মোটেই ঠিক হয় নি। এভাবে চলতে থাকলে সংগঠনের প্রতি মানুষের এখনও যতটুকু আস্থা রয়েছে ভবিষ্যতে তা ও থাকবে না । আসল কথা হল মাটির সঙ্গে সমপর্ক হীন ছেলেদের স্বেচ্ছাচার সংগঠনকে জণগন থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে। মানুষকে বিপ্লবের প্রতি সজাগ করে তোলা হলে এভাবে জোর করে সুবিধে আদায় করা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিত না। সাহায্য করার জন্য মানুষেরা নিজে থেকেই এগিয়ে আসত। প্রতিটি মানুষই এক একটি বিপ্লবী সত্বা হয়ে উঠত।

বেশিদিনের কথা নয়। লক্ষীমপুর জেলার হাওয়াজানের এক শিক্ষকের ঘরে কয়েকদিনের জন্য সংগঠনের চারজন ছেলে জোর করে আশ্রয় নিয়েছিল। শান্তিপ্রিয় মানষেরা খুব অস্বস্তিতে পড়েছিল। আরক্ষী জানতে পারলে সহজে ছেড়ে দেবে না। এদিকে বিপ্লবীদের হাতেও বন্দুক রয়েছে। ঘরে শিক্ষকের পত্নী এবং কলেজে পড়া যুবতি মেয়ে। শিক্ষকটি অনেক কিছু বিচার বিবেচনা করে সামনের থানায় গিয়ে খবর দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ মিলিটারি এসে বাড়িটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলল। গোলাগুলি চলাকালীন অবস্থায় চারজন যুবকের সঙ্গে শিক্ষকের যুবতি মেয়েটিও পেটে গুলি লাগায় মারা পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ঘর শ্মশানে পরিণত হল। মেঝেতে রক্তের বন্যা,দেওয়ালে বুলেটের ফুটো,তারপর সমস্ত ঘটনার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে শিক্ষকের মৃত্যুদণ্ড দিল সংগঠনের আদালত। গোটা ব্যাপারটা পরে দিহাঙ জানতে পেরে খুব দুঃখ পেয়েছিল। সাধারণ জণগনকে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করাটা দিহাঙের কোনোমতেই পছন্দের নয়। শান্তিতে বেঁচে থাকার আকাঙ্খাটাকে কোনোমতেই অন্যায় বলা যেতে পারে না। এটাতো মানুষের মৌলিক অধিকার। জণগনের অধিকারকে সুরক্ষিত রাখাটা যে কোনো বিপ্লবী সংগঠনের অন্যতম কর্তব্য।

কাকু,আপনাদের যদি অসুবিধে হয় তাহলে আমরা না হয় অন্য কোনো ব্যবস্থা করছি। দিহাঙ খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল। মানুষটা কিছুক্ষণের জন্য দিহাঙের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল --না,আমি ঠিক তা বলতে চাই নি।

দুটো বড় বড় বাটিতে চিড়া,দৈ এবং গুড় নিয়ে উড়নাতে মুখ ঢেকে একজন মহিলা ভেতরে চলে এল। গোল কাঠের টেবিলটায় বাটি দুটো আর দুগ্গাস জল রেখে মহিলাটি ভেতরে চলে গেলেন।

--খান। নরেনের বাবা বললেন। নয়ন এবং দিহাঙ পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল এবং বাটি দুটো হাতে তুলে নিল।

'আমাদের দলের দুটো ছেলে আসছে। তারা এলেই আমরা চলে যাব--দিহাঙ বলল। নয়ন প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে দিহাঙের দিকে তাকাল। অর্থ --কোথায় যাবে ? দিহাঙ দুপাশে মাথা নাড়াল। দেখা যাবে ।

আমার ছেলে যখন বলেছে আপনারা ইচ্ছা করলে থেকে যেতে পারেন। কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে আর্মি এসে উপস্থিত হয়। দিনকাল ভালো নয়। কেউ যদি জানতে পারে তাহলে এই বুড়ো বয়সে আমি ....মানুষটা দিহাঙের ব্যবহারে কিছুটা আশ্বাস পেয়ে মনের কথাটা বলে ফেলল।

হ্যাঁ,কাকু। আমি বুঝতে পেরেছি। আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। ছেলে দুটি এসে যাবার সময় হয়ে গেছে। ওরা এসে পড়লেই আমরা চলে যাব। আমরা আসলে...দিহাঙের কথা শেষ হওয়ার আগেই পেছনের দরজায় কার যেন টোকর পড়ল। সঙ্গে একটা চাপা কণ্ঠস্বর--'মা,দরজা খোলো। নরেন ডেকা। সঙ্গে মণি এবং রাজেন। রাজেনও সংগঠনের পাহারদারি ছেলেদের দলের সদস্য। মণি

দুজনকেই দিহাঙের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। প্রথম দৃষ্টিতে দিহাঙের ভাব হল নরেনকে আগে সে কোথাও দেখেছে । কিন্তু কোথায় দেখেছে তা ঠিক মনে করতে পারল না।

নরেনকে অন্যমনস্ক আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। একটা রুমাল দিয়ে মুখ মুছে সে দিহাঙকে বলল ---'আপনাদের এখানে তাকাটা নিরাপদ হবে না। আর্মি রাতের বেলাও আসতে শুরু করেছে। নিশান্তকে এখানে না এনে পাশের গ্রামে থাকতে দিয়েছি। খাওয়া দাওয়া করার পর আপনাদের সেখানে চলে যেতে হবে। '

আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়াই ভালো হবে। দিহাঙের কথা শেষ হওযার সঙ্গে সঙ্গেই সব কয়টি ছেলে ওঠে দাঁড়াল। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে তারা জঙ্গলের রাস্তা ধরে এগোতে লাগল। বাঁশ,আমা-কাঁঠাল,কুল প্রতিটি বাড়িরে পেছনেই এই সব ফলমূলের একটা বাগান। ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাশেই কোথাও থেকে ভেসে আসছে শিয়ালের হুক্কা-হুয়া আর কুকুরে ঘেউঘেউ চিৎ কার। রাতের পাখি ডানায় শব্দ তুলে উড়ে চলেছে। জোনাকি পোকার লাল আলো মাঝ মাঝে জ্বলে উঠছে। ওপরে তারা ভরা নীল আকাশ। সিশ্চিত হয়ে সেই রাতের বেলা এগিয়ে চলেছে ছেলেগুলি। আধঘন্টা পথ চলার পর জঙ্গল শেষ হয়ে এল। শেষ গাছটার কাছ থেকে একটা বিশাল মাঠের শুরু। ধান কাটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে কেবল নরায় ভরে থাকা মাঠটাকে জোনাকি আর তারার আলোতে বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছে। মাঠের ওপারে কিছু আলো দেখা যাচ্ছে। মাটির প্রদীপ আর বিদ্যুতের আলো। হয়তো একটি গ্রাম।

আমাদের এখন ওই গ্রামটিতে পৌছাতে হবে--মণি বলল। সেখানেই নিশান্তের সঙ্গে দেখা হবে। আমি আর এগোবো না। এরা সবাই রাস্তা চিনে। আপনারা আসুন--নরেন বলল। বিকেলের মধুর হালকা হাওয়া শরীরে পরশ বুলিয়ে গেলেও নরেন ডেকা পেন্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে নিল। দিহাঙের চোখে দৃশ্যটা ধরা পড়ল।

কিন্তু দাদা,আপনারও তো সঙ্গে যাবার কথা ছিল। --রাজেন বলল।

ছিল। তবে আমার বাড়িতে একটা কাজ রয়েছে। তোমাদের সঙ্গে আমার কাল সকালে দেখা হবে। নরেন ফিরে যেতে লাগল। ধীরে ধীরে অন্ধকারের বুকে নরেন মিলিয়ে গেল। মাঠে নামতে উদ্যত ছেলেদের হাতের ইঙ্গিতে দিহাঙ বাধা দিল। 'আমাদের এখানেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পরিস্থিতি বুঝে নেওয়া উচিত। খোলা মাঠে চট করে নেমে পড় না। --দিহাঙ বলল।

সত্যি সত্যিই কিছুক্ষণ পরে ওদের বাঁপাশে একটা কিছু নড়াচড়া করার শব্দ পাওয়া গেল। ছেলেরা সব সজাগ হয়ে রইল। কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর গুলির শব্দ বিকেলের ঘুমন্ত নির্জনতা ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। মণির কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া একটা গুলি সামনের সুপুরি গাছটার গায়ে গিয়ে বিঁধল। প্রত্যাঘাত করার জন্য প্রত্যেকেই মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। সামনের দিক থেকে অবিরাম গুলি বর্ষণ চলতে লাগল। দিহাঙরাও সমানভাবে তার জবাব দিয়ে যেতে লাগল। ভাঙ্গা কাঁচের মতো বিকেলের নীরবতা ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল...। দশ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত কিছু চুপচাপ হয়ে গেল। স্যার ,আমাদের হাতে যথেষ্ট গুলি বারুদ নেই। একটা কাজ করি। আমরা শত্রুকে এখানে ব্যস্ত রাখছি। আপনি যে পথে এসেছেন সে পথেই ফিরে যান। --নয়ন বলল।

পাগল হয়েছে নাকি ? আমি তোদের এভাবে ফেলে রেখে যেতে পারব না। দিহাঙের কিছুটা রাগই হল।

স্যার এই জঙ্গল,মাঠ,এবং গ্রামের অলি গলি সমস্ত কিছুই আমার নখদর্পণে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,আমাদের কিছু হবে না। আমাদের কিছু হলেও সংগঠনের খুব একটা ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি আপনার কিছু হয় ---মণি দিহাঙকে বোঝাতে চেষ্টা করল। ....এখানকার সমস্ত খবর ,নথি-পত্র সি এস কিউতে জমা দেওয়াটা খুব জরুরি। সংগঠনের ভবিষ্যতের সঙ্গে ব্যাপারটা জড়িয়ে রয়েছে। অন্ততঃ ততদিন আপানার পক্ষে কোনো ধরনের রিস্ক নেওয়াটা ঠিক হবে না। --নয়ন বলল। নয়ন ভেবেছিল সি এস কিউর প্রসঙ্গ উত্থাপন দিহাঙকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

সামনের দিক থেকে পুনরায় কিছু গুলি ছুটে এল। দূরে টর্চের আলো দেখা গেল। মানুষের অনুচ্চ কথাবার্তা শোনা গেল। মণি আর রাজেন গুলির দ্বারা প্রত্যুত্তর দিল।

স্যার,আমাদের কিছু হবে না। মিনতি করছি --আপনি চলে যান। সংগঠনের জন্য আপনার জীবন খুব মূল্যবান। দিহাঙকে হাত দিয়ে সরিয়ে পেছনে নিয়ে এল নয়ন। 'আমরা গুলি বন্ধ করলেই শত্রু এগিয়ে আসবে। আমরা যে সংখ্যায় কম সেই কথাটা শত্রুকে বুঝতে দেওয়াটা ঠিক হবে না। নয়ন দিহাঙকে বলে পেছেনে টানতে লাগল। সি এস কিউ র পরবর্তী মিটিঙে আপনার উপস্থিত থাকাটা খুব জরুরি। পুরনো ভুলগুলি শুধরে নিয়ে সংগঠনকে সঠিকপথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আপনার থাকাটা খবু জরুরি। পথের পাশে

একটা গাছের আড়ালে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকা দিহাঙকে সামরিক কায়দায় স্যালুট দিয়ে নয়ন মণি এবং রাজেনের দিকে দৌড়ে গেল। ঝোপঝাড়ের আড়ালে আবডালে দিহাঙ অন্যদিকে এগিয়ে চলল। গোলোগুলির শব্দ থেকে দূরে অপরিচিত একটা পথ দিয়ে দিহাঙ এগিয়ে যেতে লাগল।

কে ? প্রদীপের আলোতে বাসন ধুতে থাকা মেয়েটি মাথা তুলে ঝোপের দিকে তাকিয়ে চিৎ কার করে জিজ্ঞেস করল। জঙ্গল পার হয়ে ,মাঠ পার হয়ে অপরিচিত নদীর গরালে দুই ঘন্টা লুকিয়ে থেকে এখানে এসে পৌছেছে দিহাঙ। পুরো একটা রাত এবং একটা দিন জনপ্রাণীহীন অরণ্যে আত্মগোপন করে কাটাল দিহাঙ। শরীর অবশ হয়ে আসছে। সেদিন রাতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কিছুক্ষণ পথ চলার পরেই সে অনুমান করতে পেরেছিল গ্রাম এবং জঙ্গলের চারপাশে আর্মি গিজগিজ করছে। তাঁদের শ্যেন চোখকে ফাঁকি দিয়ে পাহাড়ের পথ ধরা সম্ভব নয় জেনেই দিহাঙ আত্মগোপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। শুকনো নরা আর ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে বুকে হেঁটে এই গ্রামে এসে পৌছেছে। একটু আহার আর নিদ্রার তাঁর খুব প্রয়োজন। রাতটা কোনোরকমে পার হলে সকালে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। দিহাঙ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে ভেবেছিল চুপচাপ বাসন মেজে মেয়েটি ভেতরে চলে যাবে। কিন্তু বাসনগুলি সেখানেই রেখে মেয়েটি দিহাঙ যে ঝোপটিতে আত্মগোপন করেছিল সেদিকে এগিয়ে এল।

কে রয়েছে ওখানে ? কে ? গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল মেয়েটি। দিহাঙ কয়েক মুহূর্তের জন্য কিছু একটা ভেবে নিল। তারপর প্রদীপের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠা জায়গাটায় বেরিয়ে আসতে চাইল। দিহাঙ ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে এসে মেয়েটির মুখ দুহাতে চেপে ধরল। প্রদীপটা মাটিতে পড়ে গেল। ভয়ে গোঁ গোঁ করতে থাকা মেয়েটির কানের কাছে মুখ নিয়ে দিহাঙ ফিসফিস করে বলল--ভয় করবেন না। আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না। মেয়েটির ছটফটানি বন্ধ হল। সে স্থির হয়ে দাঁড়াল এবং খুব সহজভাবে মুখ থেকে দিহাঙের হাতটা সরিয়ে দিতে চাইল। দিহাঙ পেছনদিক থেকে মেয়েটির কোমর জড়িয়ে ধরে এক হাতে মুখটা চেপে রেখেছিল। মেয়েটি সেভাবেই তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল এবং মুখের দিকে তাকাল। খুব পরিচিত মুখ। গভীর বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে ওঠেছে চোখদুটি। ভয়ের কোনো চিহ্ন সেখানে নেই। দিহাঙ মেয়েটির মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল। মাটিতে কাত হয়ে পড়ে থাকা নিভু নিভু প্রদীপের আলোতে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর দুজনেই প্রায় সমস্বরে চিৎ কার করে ওঠল--তুই ।

মীরার চাদরের আঁচল বুকে থেকে মাটিতে খসে পড়েছিল। সে দ্রুত আঁচলটা সামলে নিয়ে দিহাঙকে হাতে ধরে টানতে টানতে বাড়ির ভেতর নিয়ে চলল। বাঁশ দিয়ে ছাওয়া মীরাদের ঘরের চাঙে বসে দিহাঙ নয়নদের কথাই ভাবছিল। কে জানে ওরা কেমন আছে। সি এস কিউর মিটিংটা অনেক দিকে থেকেই সংগঠনের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বিষয়ের উত্থাপন করতে হবে সেখানে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ধুলো বালি ছাই লেগে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া বিপ্লবের আদর্শকে ঘষে মেজে উজজল করে তুলতে হবে। তা নাহলে দিহাঙ এভাবে নয়নদের কথা শুনে পালিয়ে আসত না। এই গ্রামে মীরার সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবার ব্যাপারটাও খুবই আশ্চর্যের। যেন চোখের সামনে থেকে কয়েকবছরের পর্দাটা সরে গেছে। দিহাঙ চলে গেছে যৌবনের মাতোয়ারা কটন কলেজের দিনগুলিতে। ফিজিক্সের শ্রেণিকক্ষে একা একা বসে থাকা দিহাঙের পাশে হুড়মুড় করে বসে পড়েছে গোলাপি শাড়ি পরা মীরা নামের সুন্দরি মেয়েটি।

একটু একটু ঘুমের ভাব আসছিল দিহাঙের। চাঙের ফুটো দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মীরা ফিসফিস করে ডাকল --নেমে আয়। নিচে ভাত খাবি। এই রাতের বেলে পুলিশ আর আর্মি এখানে আসবে না। মুসুর ডাল.আলু ভাজা ,টমেটোর চাটনি এবং জলপাইয়ের মিষ্টি আচার দিয়ে ধোঁয়া উড়তে থাকা এক থালা গরম ভাত গ্রোগ্রাসে খেয়ে ফেলল দিহাঙ। তারপর সে মীরার মুখের দিকে তাকাল।

বাড়িতে বলেছিস ?

মার শরীর ভালো নয়। অনেক আগেই শুয়ে পড়েছে। দাদা শনিবার রাতের বেলা বাড়ি আসে।--মীরা বলল।

তোর বিয়ে হয়েছে শুনেছিলাম।

দুবছর আগে মানুষটা অ্যাক্সিডেন্টে প্রাণ হারিয়েছে। শ্বশুর বাড়ি থাকতে না পেরে বাড়ি ফিরে এলাম। এখন পাশেই একটা হাইয়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে ঢুকেছি।

তুইতো বরপেটার একটা কলেজে কাজ করছিস বলে শুনেছিলাম। বিয়ের পর ওর কথামতো কলেজের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। মীরার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। দিহাঙ তার মুখের দিকে ভালো করে তাকাল। দুর্ভাগ্য ঘিরে ধরা এই মীরা আগের থেকে অনেক গভীর হয়ে ওঠেছে। চোখে মুখে আগের সেই উজজলতা নেই। মুখে বয়সের ছাপ। তবুও মীরা এখনও যথেষ্ট সুন্দর। খাওয়া দাওয়া শেষ করে থালা বাসন গুছিয়ে ঘরে ঢুকে দরজার খিল তুলে দিল মীরা। এটা তার রুম। এখান থেকে চাঙের ওপর ওঠা যায়। মৈ টা এখন

মীরার খাটের নিচে। দিহাঙ মৈ টা বের করতে চেয়েছিল। মীরা ধরফর করে ওঠল। --দাঁড়া ,একটু দাঁড়া । অনেক দিন কারো সঙ্গে কথা বলা হয় নি। দিহাঙ কিছু একটা ভাবল। তারপর বলল --তাহলে প্রদীপটা নিভিয়ে দে। তা নাহলে বাইরে থেকে দেখে কেউ সন্দেহ করতে পারে।

মীরা ফুঁ দিয়ে প্রদীপটা নিভিয়ে দিল। বাঁশের ভেন্টিলেটর দিয়ে রূপালি জ্যোৎ স্না ভেতরে চলে এল। এ ধরনের মায়াবী আলোতে সবকিছুকেই মায়াবী বলে মনে হয়। দিহাঙের সামনে বসে থাকা নীল-সাদা কাপড় পরা মীরাকে সেই অপূর্ব আলোর বর্ণচ্ছটা নিজের স্পর্শে মায়াবী করে তুলেছে। মুখ আর পিঠ ঢেকে রাখা তাঁর দীর্ঘ ঢেউ খেলা চুলে জ্যোৎ স্না থেকে লুকিয়ে রাখা অন্ধকার কিছুটা অলসভাবে মাথা গুঁজে দিয়েছে।

দিহাঙ বিছানায় ঢেলান দিয়ে অলসভাবে বসেছিল। অপূর্ব এক ভঙ্গিতে খোঁপা বেঁধে দিহাঙের পাশে বসল মীরা। তোর খবর বল --সহজভাবে বলল মীরা। দিহাঙ ম্লান হাসি হাসল। আশ্চর্যজনক ভাবে তাঁদের সামনে থেকে বর্তমান দূর হয়ে অতীতের পৃষ্ঠাগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠল। তাঁরা দুজনেই কলেজের দিনগুলির স্মৃতিতে মেতে উঠল। সুখময় দিনের আনন্দময় স্মৃতিও মানুষকে শান্তি দিতে পারে। দিহাঙ লক্ষ্য করে সংগঠন বিষয়ে কোনো কিছুই জিজ্ঞেস করে না মীরা। এটা তাঁর স্বভাব--তাঁর অপছন্দের বিষয়ে সে কখনও কথা বলতে চায় না। দিহাঙ বুঝতে পারে সংগঠনের বিষয়ে অনেক অভিযোগ মীরার মনে দানা বেঁধে ওঠেছে। ক্রমশ এক বিশাল অবসাদা দিহাঙের চোখের পাতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মীরা যেন কিছু একটা বুঝতে পারল। তুই শুয়ে পড়--আমি জেগে থাকব --মীরা বলল। আমাকে ভোর হওয়ার আগেই চলে যেতে হবে-- দিহাঙ বলল।

ঠিক আছে । আমি জাগিয়ে দেব। অন্ধকার,নির্জনতা ,পাশে একজন মমতাময়ী নারীর উপস্থিতি। পরম নির্ভরতায় দিহাঙ চোখ বুজল। বিছানা থেকে নেমে ঘরের একমাত্র কাঠেরে চেয়ারটায় বসে পড়ল মীরা। তার জীবনে কে নিয়ে এল ক্ষণিকের এই আনন্দময় মুহূর্ত গুলি। সেই যে দিহাঙের একটু আগ্রহ ,মমতাভরা চাহনি,এসবের জন্য সে আকুল হৃদয়ে ঘুরে বেড়াত। --এখন সেই দিহাঙ তাঁর শোবার ঘরে। তার বিছানায়। অবোধ এক শিশুর মতো সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু হায়--এখন তাঁদের দুজনের মধ্যে সাত সমুদ্রের ব্যবধান। দিহাঙের পাশে বসে তাঁর এলোমেলো চুল গুলিতে হাত বুলোতে তীব্র ইচ্ছা হল মীরার। সে তার দুটো হাত মুঠো করে ধরে। ধীরে ধীরে মীরা বুঝতে পারে তাঁর দীর্ঘ দিনের অনাঘ্রাত শরীর আকুল হয়ে ওঠেছে। পাপ কী পুণ্য মীরা তা জানে না। কিন্তু জানে--দিহাঙের কাছে সে কিছুতেই নিজেকে ছোট করে তুলতে পারবে না।

যদি দিহাঙ জেগে থাকত,যদি দিহাঙ তাকে কামনা করত তাহলে নিশ্চয় সে এই অবিস্মরনীয় রাতটাকে অন্যভাবে সাজিয়ে তুলত। মীরার চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল। করাতের মতো সেই কালো রাত তাকে কাটতে লাগল। ঘড়িতে টং টং করে তিনটা বাজল। দিহাঙকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল মীরা। দিহাঙের কথামতো সে দাদা র একটা পরনো লুঙ্গিআর ছেঁড়া গেঞ্জি নিয়ে এল। পোষাক পরিবর্তন করার পরে দিহাঙকে আর চেনাই যায় না। একেবারে নিঁখুত ছদ্মবেশ। তোকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব মীরা--যাবার আগে দিহাঙ মীরাকে বলল। ভালো থাকিস--মীরা বলল। ভোর হতে তখনও কিছুটা বাকি ছিল। আকাশে নানা বর্ণের তারার ঝিলিমিলি। অনেক দূরে ছিল এক পাহাড়--শিবিরগুলি বুকে নিয়ে। তরুণ স্বপ্নগুলি বুকে নিয়ে। দিহাঙ এগিয়ে গেল। পাথরের মতো মৌন হয়ে থাকা শেষ রাতটাও তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল--ভোরের দিকে।

(৮)

অসমীকে কোলে নিয়ে পাহাড়ের হেলানো জায়গাটায় বসে আছে দিহাঙ। একটু আগেই সে পলিটিকেল ক্লাসটা নিয়েছে। শিবিরটা নীরব নিস্তব্ধ। যেন তা শ্মশানের নীরবতা। ধোঁয়া,ছাই আর নীরব কান্নার শেষে নির্বিকারভাবে বেড়ে চলেছে। গুলির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হওয়া নয়ন মণি রাজেনের ফটো খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। সঙ্গে বড় বড় হরফে শিরোনাম। --সংঘর্ষে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদী নিহত। ভিখারির ছদ্মবেশে শিবিরে ফিরে আসার সময় দিহাঙ খবরটা পেয়েছিল। বড় কষ্টে সে নিজের শরীরটাকে পাহাড়ে টেনে নিয়ে এসেছিল। একধরনের অপরাধ বোধ তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। সেই রাতে তার একা চলে আসাটা উচিত হয়েছিল কি ? সংগঠনের কাছে তার জীবনের গুরুত্ব ছিল বেশি। তবুও ...।

চোখ দিয়ে নেমে আসা জলের ধারা জমাট বেঁধে বুকের মধ্যে পাথর হয়ে রয়েছে। দিহাঙের কোলে গুটিশুটি হয়ে পড়ে থাকা অসমী দিহাঙের পাথরের মতো মূর্তি দেখে বিরক্ত হল। লেঙচে লেঙচে অসমী নীল শেওলা আর কাঠফল ফুটে থাকা একটা প্রকাণ্ড টিলার দিকে এগিয়ে গেল। হেমন্ত কালের সকাল। অরণ্যের সর্বত্র একটা পাতলা রঙিণ আস্তরণ পড়েছে। বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে মন উদাস

করা মাতাল গন্ধ। ধীর গতিতে গাছ থেকে পাতাগুলি খসে পড়ছে। পোড়া মাটির রঙ ধারন করা শুকনো পাতা। পাখির ডাকে ও কী এক মন উদাস করা সুর।

উপর মহল থেকে নির্দেশ এসেছে এক সপ্তাহের মধ্যে এই শিবির বন্ধ করে দিতে হবে। শত্রুপক্ষ নাকি শিবিরের তথ্য জোগাড় করেছে এবং আক্রমণ চালানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে । গোপন সূত্রে এই খবর পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে অস্ত্র শস্ত্র আর নথিপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। শীর্ষ নেতৃত্ব প্রতি আক্রমণের নির্দেশ দেয় নি। তারজন্য পরবর্তী সভা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি এই পাহাড় ছেড়ে চলে যেতে হবে। অসমীকে ছেড়ে যেতে হবে। কোথায় যেতে হবে দিহাঙ এখনও জানে না। দূরে একমনে ঘাস চিবোতে থাকা অসমীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে দিহাঙ। তার পায়ের ক্ষত আগের থেকে অনেকটা ভালো। কিন্তু এখনও অসমীকে জোরে হাঁটতে পারে না বা দৌড়াতে পারে না। আজ বিকেলে অসমীকে জলাশয় থেকে জঙ্গলে নিয়ে যেতে হবে--দিহাঙ ভাবল। যদি পশুর দলটা দেখা যায়--আজই তাকে সেখানে ছেড়ে দিতে হবে। না হলে কাল পুনরায় --মোট কথা শিবির ছেড়ে যাবার আগে অসমীর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

'অসমী --ও অসমী দিহাঙ ডাকল। অসমী খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাঁর কাছে এল। তুই আমাকে ভুলে যাবি নাকি ?--তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে দিহাঙ জিজ্ঞেস করল। অসমী অবোধ চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে রইল এবং মাথা নিচু করে দিহাঙের কোলে মাথা ঘষতে লাগল। শিবিরের ভেতর থেকে গোভা আর রতন বেরিয়ে এসেছিল। আজ ওপর মহলের নির্দেশ নিয়ে একজনের আসার কথা। নিচে থেকে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তারপর এখানের ছেলেগুলিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।দিহাঙকে ডেকে গোভা আর রতন নীচে নামতে শুরু করেছিল। নানারঙে রঙিণ হয়ে উঠা আকাশের দিকে দেখছিল দিহাঙ। কয়েকটা চিল উড়ে বেড়াচ্ছে। টুকরো টুকরে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। এই ভাসমান মেঘখণ্ড গুলির মতোই তাঁর জীবন। সময়ের বাতাসের ওপর নির্ভরশীল। দিহাঙ ভাবল।

জংকি এসে দিহাঙের পাশে বসল। ঠিক যেভাবে নয়ন বসেছে। দিহাঙ তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল-- কী হল ? জংকি কোনো উত্তর দিল না। চারপাশের নীরবতায় মৌনতার মধ্যে বসে থাকল দুজন। হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা গেল। গোভারা যেদিকে গিয়েছে সেদিক থেকেই শব্দটা ভেসে আসছে। দিহাঙ আর জংকি চমকে উঠে দাঁড়াল। শিবিরের ভেতরে থাকা ছেলেরাও শব্দ শুনে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। পুনরায় একঝাঁক গুলির শব্দ। দিহাঙ শব্দের দিকে এগোতে উদ্যত হওয়া ছেলেদুটিকে বাধা দিল। একটু অপেক্ষা কর। হঠাৎ জঙ্গল ভেদ করে গোভা দৌড়ে এল।

'আর্মি স্যার। আজই এসেছে আর্মি। রতনের গায়ে গুলি লেগেছে। ওরা তাকে ধরে ফেলেছে। গোভা ফোঁপাতে লাগল।

'কত জন আছে ?

'বুঝতে পারি নি । তবে অনেক বলেই মনে হল। দুদিকে থেকেই এসেছে। 'উত্তেজনায় লাল হয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল গোভা। এখন সিদ্ধান্ত নেবার সময়। দিহাঙ তৎ পর হয়ে উঠল। ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল --এখনই শিবির ছেড়ে যেতে হবে। আত্মরক্ষার জন্যও এখন আমাদের হাতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র নেই । দ্রুত হাতে পিঠের ব্যাগটায় ছোটখাট কিছু জিনিস ভরে নিয়ে অনির্দিষ্ট যাত্রার জন্য তৈরি হল। পায়ের কাছে মুখ ঘসতে থাকা অসমীর দিকে তাকিয়ে দিহাঙ বলল --তোরা যা । আমি একটু পরে যাচ্ছি। ছেলেরা অবাক হল।

কেন স্যার ? সবাই এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করল। অসমীকে কোলে তুলে নিয়ে দিহাঙ বলল --একে রেখে আসি তোরা যেতে থাক। দিহাঙের গলার স্বর কঠোর হল। সবাই জানে --এই কঠোরতা ভেদ করে দিহাঙকে আর কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা সম্ভব নয়। ছেলেরা শিবিরের পেছন দিকে থাকা খাড়া পাহাড়টার দিকে একটা আঁকা বাঁকা পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। অসমীকে কোলো নিয়ে দিহাঙ জলাশয়ের দিকে এগিয়ে চলল।

....পেছনে গুলির শব্দ শোনা গেল। ছেলেরা যেদিকে গিয়েছিল ,সেদিক থেকেই শব্দটা আসছে। থেমে থেমে পুনরায় এক ঝাঁক গুলির শব্দ। তারপর ধারাসার গুলির শব্দ ভেসে আসতে লাগল। আশঙ্কায় দিহাঙের চলার গতি মন্থর হয়ে এল। অসমীকে রেখে সে সেই শব্দের দিকে এগিয়ে যাবে--নিশ্চিতভাবে যাবে। সতীর্থকে বিপদের সময় ছেড়ে যাবার বেদনা এবং অপরাধবোধ আরেকবার সে সহ্য করতে পারবে না। গুলির শব্দে অসমী ভয় পেয়ে গেছে। গুটিশুটি অসমী দিহাঙের বুকের কাছটাতে ঢুকে পড়ল। দিহাঙের চলা দ্রুত হল। সেই পরিচিত অরণ্যে এখন কি আর সেই পশুর দলটা রয়েছে ? না কি অসমীকে একাই ছেড়েই আসতে হবে ? পেছনের হালকা

বাতাস যেন ক্রমশই ভারী হয়ে আসছে। শুকনো পাতায় মর্মর ধ্বনি তোলা কি অনেক মানুষের পায়ের শব্দের ইঙ্গিত বহন করে আনছে না। থমকে দাঁড়িয়ে দিহাঙ চারপাশে তাকাল। ডানহাত দিয়ে কোমরে রাখা বন্দুকটা একবার স্পর্শ করে নিল। একটা অদ্ভুত কমপন সমগ্র অরণ্যটাকে ঘিরে ফেলেছে। গাছপালার ওপর দিয়ে উদাসভাবে বয়ে যাওয়া সেই কমপন রোগীর গায়ের কমপনের মতো। মৃদু অথচ নির্মম এবং বেদনাদায়ক। পুনরায় সামনের দিকে এগিয়ে চলল দিহাঙ।

সে অনুভব করল ,তাঁর ডাইনে বাঁয়ে অসংখ্য পদশব্দ। যেন অনেক বন্দুকের নল তার দিকে তাক করা আছে। তাহলে কি এখানেই শেষ ? চোখের সামনে শেষবারের মতো ঝিলমিল করে উঠল এই চিরন্তন পৃথিবীর চিরায়ত আলো। দিহাঙের চলার গতি দ্রুত হল। অসমীকে সজোরে বুকে জড়িয়ে ধরল সে। সে নিশ্চিত হল তার চারপাশটা বিড়ালের মতো সতর্ক ভঙ্গিতে অসংখ্য অস্ত্রধারী সৈন্য ঘিরে ফেলেছে। কিন্তু ওরা গুলি ছুঁড়ছে না কেন ? তাহলে কি দিহাঙ রাজগুরুকে তারা জীবন্ত বন্দি করতে চায় ? এভাবে ---যেন অনন্তকাল পরে ,যেন অনন্তকাল পথ অতিক্রম করার পরে দিহাঙ জলাশয়টা দেখতে পেল। ঘাসের আচ্ছাদন মুক্ত। পশুর দলটা নেই। কেউ নেই। জলাশয়ের পাশে নাম না জানা অনেক নীল ফুল ফুটেছিল। হেমন্তের রক্তিম ধূসরতায় সদর্পে ঝলসে উঠা বেগুনি রঙের বন্য ফুলের ঝোপটার কাছে অসমীকে কোলে নিয়ে দিহাঙ দাঁড়াল।

অসমীকে সে কোল থেকে নামিয়ে দিল। অরণ্যের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়া নির্মম কমপনটা তার শরীরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে অসমী তার গলাটা দিয়ে দিহাঙের একটা পা জড়িয়ে ধরতে চাইল। গুড়ুম । শূন্যে একটা শব্দ হল। জলাশয়টা থেকে এক ঝাঁক পাখি আকাশের দিকে উড়ে গেল। দিহাঙ অসমীর কাছে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ল। সে দেখতে পেল বন্দুক উঁচিয়ে প্রায় কুড়িজন সৈনিক তার দিকে এগিয়ে আসছে।

হ্যাণ্ডস আপ।--একজন চিৎ কার করে উঠল। দিহাঙ চারপাশে তাকিয়ে কিছু একটা ভাবল। বন্দুক বের করা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। গুলির ঝড় বয়ে যাবে। তার সঙ্গে অসমীও মারা যাবে। দিহাঙ অসমীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বিড়বিড় করে বলল --আমাকে ক্ষমা করে দিস অসমী। তার হাতটা এবার নিজে থেকেই কোমরের দিকে এগিয়ে গেল। হ্যাণ্ডস আপ।-- পুনরায় একটা চিৎ কার ভেসে এল। বন্দুক খামচে ধরা হাতটা সেভাবেই রাখল দিহাঙ। কিছু একটা ভেবে পেছন দিকে তাকাল। গুড়ুম। একটা গুলির শব্দ। দিহাঙের মনে হল তার উরুর ভেতর একটা তপ্ত লোহার শলা যেন কেউ ঢুকিয়ে দিয়েছে। হড়হড় করে বেরিয়ে আসা রক্তে মুহূর্তের মধ্যে চারপাশটা ভিজে উঠল। প্রচণ্ড শব্দে আরও একটা গুলি এবার দিহাঙের বাহু ভেদ করে চলে গেল। রক্তে ভেজা ঘাসে চিৎ হয়ে পড়ে গেল দিহাঙ। হেমন্তের রঙিণ প্রকৃতি তাঁর মুদে আসা চোখের সামনে নৃত্য করতে লাগল। ধূসর রক্তিম আকাশের রঙ ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে এল। সেই ধোঁয়াশাময় আকাশ থেকে অসম্ভব উজজল একটা আলো তার চোখে ফুলের মতো খসে পড়ল। চেতনা হারানোর আগে মাথা হেলিয়ে অসমী কোথায় দেখার চেষ্টা করল --কিছুই দেখতে পেল না। কেবল মাত্র বুট জুতোর শব্দ অরণ্যকে পিষ্ট করে তার দিকে এগিয়ে আসার আভাস পেল।

পরিশিষ্ট

বহু বছর পার হয়ে গেছে। অনেকবার গাছ গুলি ডালপালা খসিয়ে শীর্ণ হল। পুনরায় সবুজে সবুজময় হয়ে উঠল। ফুল ফুটল। ঝরে পড়ল। কোথায় কোন সুদূর থেকে উড়ে আসা পাখিরা পানবাজারের প্রকাণ্ড গাছগুলির মধ্যে বাসা বাঁধল। ডিম পাড়ল। সেই ডিম ফুটে বাচ্চা হল। একদিন তারাও কোন সুদূরে উড়ে চলে গেল। কখনও ক্ষীণকায় হয়ে আবার কখনও জলে দুকূল প্লাবিত করে চিরন্তন লুই বয়ে যেতে লাগল। কিন্তু রোদ বৃষ্টি স্পর্শ না করা ,ফুল না ফোটা ,পাখি না উড়া একটা দগ্ধ পৃথিবী চারপাশ থেকে নাগপাশের মতো দিহাঙকে জড়িয়ে ধরতে লাগল। জীবন কি এরকম --স্রোতহীন। বদ্ধ জলাশয়ের জলের মতো স্থবির আর শ্রান্ত। কারাগারের বদ্ধ কুঠরির মধ্যে শুয়ে শুয়ে দিহাঙ ভাবতে থাকে। মহানগরের প্রতিশ্রুতিহীন ধোঁয়াশা আকাশ চুপ করে থাকে। কতদিন ধরে মহানগরীর আকাশ নীল দেখে নি। ধুলায় ঢেকে রাখা রাতের আকাশে তারা ফুটে নি। দিহাঙ তাঁর বুকের মধ্যে হাতড়ে বেড়ায়। ঘুমন্ত অগ্নিমুখের মতো শুয়ে আছে তার বিপ্লবী সত্তা এবং বিপ্লব। শ্যামল পাহাড়ের শিবিরগুলি ভেঙ্গে ফেলা হল। লাল সূর্যের স্বপ্ন দেখা অনেকগুলি চোখে এখন ক্ষমতা আর বৈভবের ছায়া। যে আদর্শকে অনুসরণ করে দিহাঙরা একদিন ঘরের বাইরে বেরিয়েছিল --সেই আদর্শ এখন নিজেই পথভ্রষ্ট পথিকের মতো আতুর। কোথায় কী ভুল থেকে গেল --দিহাঙ ফিরে তাকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সান্ধ্য ছবির মতো আলো-ছায়া কোনো কিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠে না। দিহাঙ একটা সবুজ অরণ্যের স্বপ্ন দেখে। একটা সবুজ পাহাড়ের এবং নির্জনতার স্বপ্ন দেখে। কোথা থেকে নয়ন এসে তার কাছে বসে। বাতাসে হেলতে দুলতে থাকা বিকেলের ঝকমকে ফুলগুলির দিকে তাকিয়ে নয়ন বিড়বিড় করে

--একটা কবিতা শোনান। খোঁড়াতে খোঁড়াতে অসমী আসে। অবোধ শিশুর মতো দিহাঙের কোলে মুখ গুঁজে দেয়। দিহাঙ শুয়ে শুয়ে একটা পাইন অরণ্যের স্বপ্ন দেখে। পাইনের বাতাস বয়ে নিয়ে আসা মায়ের দুঃখী দুঃখী মুখটা তার বুকে আঁচর কেটে যায়। ইস । কতদিন যে মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমোনো হয় নি। ক্রমশ এই সব ছবিগুলিই স্বপ্নের কুয়াশায় ঢেকে যায়। একটা ধান রঙের মুখ স্পষ্টতর হয়ে উঠে। জাহ্নবীর মুখ। গাল বেয়ে গড়িয়ে আসা চোখের জলকে বাধা দিতে প্রাণপন চেষ্টা করতে থাকা একখানি শান্ত সুন্দর কোমল মুখ। স্বপ্ন আর বাস্তবের একটা স্পর্শরেখা দিহাঙকে চারপাশ থেকে বেঁধে ফেলতে চায়। চোখের কোনে পরতে পরতে মেঘ জমে। কারাগারের চারসীমা অস্পষ্ট হয়ে আসে। অতীত ,বর্তমান অস্পষ্ট হয়ে আসে। ....আর সেই প্রচ্ছন্নতা থেকে দিহাঙকে মুহূর্তের জন্য তুলে ধরতে তিনি আসেন --সেই অনন্যসাধারণ মানুষটি। স্বপ্ন নাকি। দিহাঙ দুচোখ ভালো করে মেলে ধরে। তিনি তো দূরের রামধেনু ছিলেন--কোনপথে তার ঋতুহীন পৃথিবীতে নেমে এলেন।

দিহাঙ সেই উজজল ,সপ্রতিভ মানুষটার মুখের দিকে স্তব্ধ ভাবে তাকিয়ে থাকে। জীবনের গোধূলি বেলায়ও মানুষটার দেবীপ্রতিমার মতো খনিকর আঁকা চোখ-মুখ প্রেম এবং মমতায় টলমল করছিল।

মামণি রয়সম ..মামণি রয়সম ...দিহাঙ সেই মন্ত্রপূত নাম আওড়ে চলে। ধূলি ধূসরিত অন্ধকারের মধ্যে যেন আলোর সুতোর মতো একটা ক্ষীণ পথ ভেসে ওঠে। মানুষটা দিহাঙের বুকের দিকে তাকায় আর ইস ইস করে বলে ওঠে তোমার এত কষ্ট। তিনি দিহাঙের হাতে একটা কলম তুলে দেন। এক ঝাঁক আশীর্বাদের মতো স্পর্শ করেন তার হাত --সুখি হও। কাঁপা কাঁপা হাতে দিহাঙ কলমটা খামচে ধরেন। যেন তা অন্ধকারের শিকড় উপড়ে ফেলতে সক্ষম একটা মায়াবী ছুরি। দূরে কোথায় --নদীর ডরিয়লিতে কবে কোন একদিন হারিয়ে যাওয়া একটা ছায়া যেন এক পা দু পা করে দিহাঙের দিকে এগিয়ে আসে। সে উঁকি ঝুঁকি মেরে তাকিয়ে দেখে --সেটা কি তার ছায়া --না কি সে।

(হাতে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া একজন সংগ্রামী সতীর্থের কথামতো একবার একটা হরিণকে গুলি করেছিল। পরে তাকে শুশ্রূষা করা জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছিল। এককালের সেই সংগ্রামী যুবকটিকে আমরা এখন কবি মেগন কছারি বলে জানি। উক্ত কাহিনিটি 'দেওবরীয়া অনুভূতিত' পড়ার পরে একটা গল্প লিখব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু একহাতে বন্দুক আর একহাতে কবিতা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষটা সমপর্কে অনেক কথাই তো কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। তাই গল্প না হয়ে ডরিয়লি উপন্যাস হল। উক্ত ঘটনাগুলি ছাড়া বাকি সমস্ত চরিত্র এবং ঘটনা কাল্পনিক। মেগন কছারীর সঙ্গেও উপন্যাসের বাকি অংশের কোনো মিল নেই। --লেখক)